

ଅଟ୍ଟିତ ଓ ଛିତ୍ତିହୁ

ମନ୍ଦମ୍ବ ଶ୍ରୀମଦ୍



ପଶ୍ଚିମବঙ୍ଗ ମଧ୍ୟଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟ

সংস্করণ

প্রথম সংস্করণ	: অক্টোবর, ২০১২
দ্বিতীয় সংস্করণ	: অক্টোবর, ২০১৩
তৃতীয় সংস্করণ	: অক্টোবর, ২০১৪
চতুর্থ সংস্করণ	: ডিসেম্বর, ২০১৫
পঞ্চম সংস্করণ	: ডিসেম্বর, ২০১৬
ষষ্ঠ সংস্করণ	: ডিসেম্বর, ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ত্ব

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যবেক্ষণ

প্রকাশক

অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যবেক্ষণ
৭৭/২ পার্ক সিট্টি, কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬



সত্যমব ব্রহ্মতে

ভারতের সংবিধান

প্রাঞ্চাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে সত্যনির্ণয়ের সঙ্গে শপথ প্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা; সামাজিক প্রতিষ্ঠা আর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সন্তুষ্টি ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনির্ণিত করে সৌভাগ্য গড়ে তুলতে; আমাদের গণপরিষদে, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভূমিকা

‘পরিবেশ ও ইতিহাস’ পর্যায়ভুক্ত সপ্তমশ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ‘অতীত ও ঐতিহ্য’ প্রকাশিত হলো। ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াবার জন্য ‘অতীত ও ঐতিহ্য’ বইটিতে ধাপে ধাপে অতীত বিষয়ক বিভিন্ন ধারণা পরিবেশন করা হয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কয়েকটি প্রসঙ্গের আলোচনা। জাতীয় পাঠ্কর্মের বৃপরেখা-২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯—এই নথিদুটিকে নির্ভর করে এই বৈচিত্র্যময় অভিনব পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত একটি ‘বিশেষজ্ঞ কমিটি’-কে বিদ্যালয়স্তরের পাঠ্কর্ম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায়, নিরলস শ্রমে পাঠ্কর্ম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী ‘পরিবেশ ও ইতিহাস’ বইটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

এই বইটিতে নানা ধরনের প্রামাণ্য যুগোপযোগী ছবি এবং মানচিত্রও প্রতিটি অধ্যায়ে সংযোজিত হলো। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী অতীত এবং ঐতিহ্য বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে, বইটি জুড়ে আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে নানা সারণির ব্যবহারও করা হয়েছে। আশা করি, নতুন পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীমহলে সমাদৃত হবে।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও অলংকরণের জন্য খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ—যাঁদের নিরস্তর শ্রম ও নিরলস চেষ্টার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনন্বীক্ষ্য।

‘পরিবেশ ও ইতিহাস’ বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

ডিসেম্বর, ২০১৭
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

কল্পনা মন্ত্রী
প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যবেক্ষণ

প্রাক্কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি ‘বিশেষজ্ঞ কমিটি’ গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠ্কর্ম, প্যাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক-এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠ্কর্ম, প্যাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। পুরো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই জাতীয় পাঠ্কর্মের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act, 2009) নথিদুটিকে আমরা অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি সমগ্র পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের ইতিহাস বইয়ের নাম ‘অতীত ও ঐতিহ্য’। নতুন পাঠ্যসূচি অনুসারে বইগুলি ‘পরিবেশ ও ইতিহাস’ পর্যায়ভুক্ত। সপ্তম শ্রেণির ইতিহাসের বইটি সহজ ভাষায় লেখা হয়েছে। নতুন পাঠ্যপুস্তকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তার মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাথমিক কয়েকটি ধারণাকেও একটি অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই বইতে আধ্যানমূলক বিবরণের মাধ্যমে গল্পছলে এক একটি বিশেষ সময়ের ঘটনাবলিকে শিক্ষার্থীর সামনে পরিবেশন করা হয়েছে। একদিকে নজর দেওয়া হয়েছে যাতে তথ্যভার অতিরিক্ত আকারে শিক্ষার্থীকে বিড়ন্তি না করে, আবার অত্যধিক সরল করতে গিয়ে ইতিহাসের প্রয়োজনীয় যোগসূত্রগুলি যেন তার কাছে অস্পষ্ট না হয়ে যায়। সেই বিশেষ স্থান-কালের সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, জীবনচর্যার যথাযথ মূর্ত অবয়ব যেন তার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইতিহাসের মৌল ধারণা নির্মাণের ক্ষেত্রে এই পাঠ্যপুস্তকে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে। প্রাসাঙ্গিক বিষয়-ঘটনা পর্যালোচনার মাধ্যমে এইভাবে শিক্ষার্থী ইতিহাসকে জীবন্ত এবং অর্থবাহী একটি প্রবাহ হিসেবে বিচার করতে শিখবে। বেশ কিছু প্রামাণ্য ছবি এবং মানচিত্র সেকারণেই বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষেই সংযোজিত আছে নমুনা অনুশীলনী--‘ভেবে দেখো খুঁজে দেখো। সেগুলির মাধ্যমে হাতেকলমে এবং স্ব-স্বতন্ত্র নিরিখে শিক্ষার্থীরা ইতিহাস বিষয়টি নিয়ে নানা ধরনের চর্চা করতে পারবে। বইয়ের শেষে ‘শিখন পরামর্শ’ অংশে শ্রেণিকক্ষে বইটি ব্যবহার প্রসঙ্গে কয়েকটি মূল্যবান প্রস্তাব মুদ্রিত হলো। দক্ষ যশস্বী শিল্পীরা বইগুলিকে রঙে রেখায় আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্মিত এই পাঠ্যপুস্তকটি ইতিহাস শিখনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রয়োজন করবে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অঞ্চল সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়মক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যবেক্ষণ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যবেক্ষণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভৃত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করবো।

ডিসেম্বর, ২০১৭

বিকাশ ভবন

পঞ্চমতলা

বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

তৃতীয় মুদ্রণ

চেয়ারম্যান

‘বিশেষজ্ঞ কমিটি’

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্যবেক্ষণ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)
রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্যসচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা তত্ত্বাবধান

শিরীণ মাসুদ (অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

পাণ্ডুলিপি নির্মাণ এবং পরিকল্পনা ও সম্পাদনা-সহায়তা

উত্তরা চক্রবর্তী	সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়	অনিবার্য মণ্ডল
সৈয়দ আবিদ আলী	তিস্তা দাস	প্রত্যয় নাথ
প্রবাল বাগচী	সোমদত্ত চক্রবর্তী	পরমা মাইতি

গ্রন্থসজ্জা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : শঙ্খ বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রণ সহায়তা : বিপ্লব মণ্ডল
অনুপম দত্ত

সূচিপত্র

বিষয়

পৃষ্ঠা

১. ইতিহাসের ধরণ	১
২. ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের কানোকটি ধারা :	
খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক	৭
৩. ভারতের সমাজ, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতির কানোকটি ধারা :	
খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক	২৫
৪. দিল্লি সুলতানি : তুর্কো-আফগান শাসন	৪৩
৫. মুসলিম সাম্রাজ্য	৬৯
৬. নগর, বাণিজ্য ও বাণিজ্য	৯১
৭. জীবনযন্ত্রা ও সংস্কৃতি : সুলতানি ও মুসলিম সুগ	১১৩
৮. মুসলিম সাম্রাজ্যের সংকট	১৫৯
৯. আজ্বরের ভারত : সরকার, গণতন্ত্র ও স্বামীশোধন	১৬৭
 শিখন সমাচার	১৭৩



প্রথম অধ্যায়

ইতিহাসের গল্প-সন্ধি



১.১ ইতিহাসের গল্প-সন্ধি

যত পুরোনো দিনের কথাই হোক, গল্পের মতো করে বললে সবারই ভালো লাগে। কিন্তু মুশকিল হলো অনেক ইতিহাস বইতেই গল্পগুলি ভালো জমে না। খালি রাজা-উজিরের নাম-ধার, যুদ্ধের সাল-তারিখ। তাই ইতিহাস পড়তে গিয়ে গল্পের মতো সেই মজাটা সবাই পায় না। গুলিয়ে যায় নামগুলি। মনে থাকে না সাল-তারিখ। কে কার পরে ক্ষমতায় এলেন—সেসব মনে রাখা খুবই কঠিন!

কিন্তু কঠিন হলোও একটু আধুন নাম বা সাল মনে রাখা জরুরি। কারণ, যে সব ঘটনার কথা ইতিহাস বইতে থাকে, সেগুলি আজ থেকে অনেক-অনেক বছর আগে ঘটেছিল। আবার সব ঘটনাগুলি একই দিনে বা একই বছরে ঘটেনি। তাহলে কীভাবে জানা যাবে কোন ঘটনাটা কবে ঘটেছিল? তাই আগে-পরে করেই সাজাতে হয় ইতিহাসকে। তার জন্য জানতে হবে ঘটনাগুলির সময়কাল। ইতিহাসে সময় মাপতে গেলে চাই তারিখ, মাস, সাল, শতাব্দী, সহস্রাব্দ—এইসব নানা সময় মাপার হিসাব। সেখানে সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টার হিসাব বিশেষ কাজেই লাগে না! তাই সাল-তারিখগুলি যতই জটিল হোক, আসলে ওরা নির্দোষ। পাছে আমরা সময়ের হিসাবে গোলমাল করে ফেলি, তাইতো ওরা আমাদের সাবধান করে দেয়। ফলে ইতিহাস বইতে একটু-আধুন সাল-তারিখ থাকবেই। নানান ধাঁধা বা মজার হিসাব করে সাল-তারিখ মনে রাখাটা একটা খেলা। দেখোতো, কত ভালো করে তোমরা এই খেলাটা খেলতে পারো বছর জুড়ে।

জটিল নাম-ধারগুলো নিয়ে দুশ্চিন্তা তবু থেকেই গেলো। কারো যদি নামের আগে ‘গঙ্গাইকোণ্ডচোল’ বা ‘সকলোভরপথনাথ’-এর মতো উপাধি বসে! কারো যদি নাম হয় ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজি! এসব নাম বা উপাধি মনে রাখা খুবই কঠিন। কিন্তু এই উপাধি বা নামগুলি অনেক কাল আগের মানুষদের। তাঁরাও হয়তো এতো বড়ো বড়ো নাম-উপাধি নিয়ে গোলমালে পড়তেন। কিন্তু উপায় ছিল না। এই সময় এমন বড়ো খটোমটো উপাধি এবং নামেরই চলন ছিল। সেই নামগুলি এখন আর বদলে নেওয়ার উপায় নেই। বাবর, আকবর প্রভৃতি নামগুলি বেশ ছোটো, সহজেই মনে থাকে।



“বাবার হইল আবার জুর
সারিল পেঁচাই”— এই
বাক্যটায় ছ-জন মুঘল
সম্রাটের নামের হানিশ
লুকিয়ে আছে।
দেখোতো নামগুলি খুঁজে
পাও কিনা? সূত্র লুকিয়ে
আছে পঞ্চম অধ্যায়ে।



ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ପ୍ରେସର୍

କିନ୍ତୁ ଯତୋହି ଶକ୍ତ ଲାଗୁକ, ଦନ୍ତିଦୂର୍ଗ ନାମେର କାଉକେ-ତୋ ଆର ଛୋଟୋ କରେ ଦନ୍ତି ବା ଦୂର୍ଗ ବଲେ ଲେଖା ଯାଯ ନା !

କିନ୍ତୁ ଧରା ଯାକ ତୋମାଦେର କାରୋ କାରୋ ବେଶ ମନେ ଥାକେ ସବ ନାମ ବା ସାଲ । ଇତିହାସ ବୁଝାତେ ପାରା କି ତାକେହି ବଲେ ? ସୋଜା କଥାଯ ଏର ଉତ୍ତର ହଲୋ— ନା । ସାଲ-ତାରିଖ ନାମ-ଧାର ମୁଖସ୍ଥ ଥାକଲେହି ଇତିହାସ ଜାନା ହୟ ନା । ତାହଲେ ଇତିହାସ ଜାନା କାକେ ବଲେ ? ଛୋଟୋ କରେ ବଲଲେ ବଲା ଯାଯ, ବଚରେର ପର ବଚର ଘଟା ନାନାନ ଘଟନାର ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକେର ଅନେକ କାଜକର୍ମେର କାରଣ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ବୋବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଇ ଇତିହାସ ଜାନା । ଏମନ ଅନେକ ଘଟନା ଏବଂ କାଜ ଆଗେ ଘଟେଛେ, ଯାର ଛାପ ଆଜତେ ଆମାଦେର ଚାରପାଶେ ରଯେଛେ । ତାଇ ସେଇ ସବ କାଜ ଏବଂ ଘଟନାଗୁଲୋ ବିଷୟେ ଆମାଦେର ଧାରଣା ଥାକା ଦରକାର । ସେଇ ଧାରଣା ତୈରିର ଜନ୍ୟଇ ଇତିହାସ ପଡ଼ାର ଦରକାର ହୟ ।

ଟୁକରୋ କଥା

ଇତିହାସେର ଉପାଦାନ

ଇତିହାସେର ସବ ଉପାଦାନ ଏକରକମ ନଯ । ଏକଟି ପୁରୋନୋ ମୂର୍ତ୍ତି, ପୁରୋନୋ ମୁଦ୍ରା ବା ପୁରୋନୋ ବୈହି ଏକ ଜିନିସ ନଯ । ତାଇ ଇତିହାସେର ଉ ପାଦାନଗୁଲିକେଓ ନାନା ଭାଗେ ଭାଗ କରା ହୟ । ଯେମନ— ଲେଖ, ମୁଦ୍ରା, ମ୍ୟାପତ୍ୟ-ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଓ ଲିଖିତ ଉପାଦାନ । ପାଥର ବା ଧାତୁର ପାତେ ଲେଖା ଥେକେ ପୁରୋନୋ ଦିନେର ଅନେକ କଥା ଜାନା ଯାଯ । ସେଗୁଲିକେ ବଲେ ଲେଖ । ତାମାର ପାତେ ଲେଖା ହଲେ ତା ହୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ । ଆବାର ପାଥରେର ଉପର ଲେଖା ହଲେ ତା ହୟ ଶିଳାଲେଖ । ଆର କାଗଜେ ଲେଖାଗୁଲିକେ ବଲା ହୟ ଲିଖିତ ଉପାଦାନ ।

୧.୨ ଇତିହାସ ଜାନାର ରକମଫେର

ପୁରୋନୋ ଦିନେର ଯେସବ ଜିନିସ ଆଜତେ ରଯେ ଗେଛେ ସେଗୁଲେହି ଅତୀତେର କଥା ଜାନତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ପୁରୋନୋ ଘର-ବାଡି, ମନ୍ଦିର-ମସଜିଦ, ମୂର୍ତ୍ତି, ଟାକା-ପଯ୍ସା, ଆଁକା ଛବି, ବିହିପତ୍ର ଥେକେ ଏକ ଏକଟା ସମଯେର ମାନୁଷେର ବିଷୟେ ଆମରା ଜାନତେ ପାରି । ତାଇ ସେଗୁଲି ଇତିହାସେର ଉପାଦାନ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର କୋପେ ଆର ମାନୁଷେର ହାତେ ପଡ଼େ ସେସବ ଉପାଦାନେର ଅନେକ କିଛୁଇ ଆଜ ଆର ନେଇ । ତାଇ ଏକଟାନା ଇତିହାସ ଜାନାର ଉପାୟଓ ନେଇ । ଭାଙ୍ଗଚୋରା, ଛିଁଡ଼େ ଯାଓୟା ଉପାଦାନେର ଟୁକରୋ ଖୁଁଜେ ଜୁଡ଼େ ନେନ ଐତିହାସିକ । ତାରପର ସେଗୁଲିକେ ସାଜିଯେ ନେନ ଆଗେ ପରେ କରେ । ତାର ଥେକେ ତୈରି କରେନ ଅନେକ ଆଗେର ସେଇ ସମଯେର ଏକଟା ଛବି । ଆର ଯେଥାନେ ଉପାଦାନେର ଟୁକରୋ ପାଓୟା ଯାଯ ନା, ସେଥାନେ ଫାଁକ ଥେକେ ଯାଯ ।

ଟୁକରୋ ଉପାଦାନ ଦିଯେ ଇତିହାସେର ଫାଁକ ଭରାଟ କରାର ସମୟ ଐତିହାସିକକେ ସାବଧାନ ଥାକତେ ହୟ । ଖୋଲାଲ ରାଖତେ ହୟ ଯାତେ ଠିକ ଟୁକରୋ ଠିକ ସମଯେ ଖାପ ଖାଯ । ସମୟ ଆର ଜାଯଗା ଆଲାଦା ହୟେ ଗେଲେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରେ ବଦଳେ ଯାଯ କଥାର ମାନେ । ସେଟା ଐତିହାସିକକେ ମନେ ରାଖତେ ହୟ । ଆଜକାଳ ତୋମରା ‘ବିଦେଶ’ ବଲତେ ଭାରତେର ବାହିରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶେର ଲୋକେଦେର ବୋବୋ । କିନ୍ତୁ ସୁଲତାନି ବା ମୁଘଲ ଯୁଗେ ‘ବିଦେଶ’ ବଲତେ ଗ୍ରାମ ବା ଶହରେର ବାହିରେ ଥେକେ ଆସା ଯେ କୋନୋ ଲୋକକେହି ବୋବାତୋ । ତାଇ ଶହର ଥେକେ ଅଚେନା କେଉ ଗ୍ରାମେ ଗେଲେ ତାକେଓ ଐ ଗ୍ରାମବାସୀରା ‘ପରଦେଶ’ ବା ‘ଅଜନବି’ ଭାବତେନ । ଫଳେ ମୁଘଲ ଯୁଗେର କୋନୋ ଲେଖାଯ ‘ପରଦେଶ’ କଥାଟା ଦିଯେ ସବସମୟ ଭାରତେର ବାହିରେ ଥେକେ ଆସା ଲୋକ ବୋବାତୋ ନା, ସେଟା ଖୋଲାଲ ରାଖତେ ହବେ । ଆବାର ଧରୋ, ‘ଦେଶ’ ବଲତେ ଅନେକେହି



ତାଦେର ଆଦି ବାଡି ବୋଲେନ । ଯେମନ, କେଉ ହ୍ୟାତୋ ବଲେନ— ତା'ର ଦେଶ ବର୍ଧମାନ । ଏଥାନେ ‘ଦେଶ’ ଆସଲେ ଏକଇ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟେ ଆଲାଦା ଅଞ୍ଚଳକେ ବୋଲାଚେ । କାରଣ ବର୍ଧମାନ ଜାୟଗାଟି ଭାରତ ବା ପାକିସ୍ତାନେର ମତୋ ଦେଶ ନୟ । ସେଟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଏକଟି ଜେଲା ମାତ୍ର । ତାହଲେ ଦେଖୋ ସୁଲତାନି ବା ମୁଘଲ ଆମଲେ କିଂବା ଆଜକେର ଦିନେଓ ‘ଦେଶ’ କଥାଟାର କତୋ ରକମ ବ୍ୟବହାର ହ୍ୟ । ଯଥନାଇ ଇତିହାସ ପଡ଼ିବେ ତଥନ ଆଗେ ବୁଝେ ନେବେ କୋନ ସମୟେ କୋନ ଅଞ୍ଚଳେର କଥା ସେଥାନେ ବଲା ହଚେ ।

ଏହି ବହିତେ ପ୍ରାୟ ହାଜାର ବଚରେର ଭାରତେର ଇତିହାସ ତୋମରା ଜାନବେ । ମୋଟାମୁଟି ଖ୍ରିସ୍ତୀଯ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶତକ ଥେକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶତକ ପେରିଯେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତକେର ଦୋରଗୋଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ହାଜାର ବଚରେ ଭାରତବର୍ଷେ ଅନେକ କିଛୁ ବଦଳ ଘଟେଛେ । ଆବାର କିଛୁ କିଛୁ ବିଷୟେ ମିଳ ରଯେ ଗେଛେ । ତବେ କୋନୋ ବଦଳଇ ରାତାରାତି ଘଟେନି । ଏଥାନେ ସେଇ ଧାରାବାହିକ ବଦଳଗୁଲିର ନାନା କଥାଇ ବଲା ହଯେଛେ ।

ଟୁକରୋ କଥା

ହିନ୍ଦ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ହିନ୍ଦିଆ

ଖ୍ରିସ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠୀ-ପଞ୍ଚମ ଶତକେ ଗ୍ରିକ ଐତିହାସିକ ହେରୋଡୋଟାସ ‘ହିନ୍ଦିଆ’ ନାମଟି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହାର କରେଛିଲେନ । ତିନି ଅବଶ୍ୟ ଏଦେଶେ ଆସେନାନି । ତିନି ପାରସିକ ଲେଖାପତ୍ର ଥେକେ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କେ ଜାନତେ ପେରେଛିଲେନ । ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତେର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ବ-ଦୀପ ଏଲାକା କିଛୁଦିନେର ଜନ୍ୟ ପାରସିକ ସାମରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତଭୁକ୍ତ ହେଯେଛିଲ । ତଥନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳେର ନାମ ହ୍ୟ ‘ହିନ୍ଦୁସ’ । ଇରାନି ଭାଷାଯ ‘ସ’-ଏର ଉଚ୍ଚାରଣ ନେଇ । ତାଇ ‘ସ’ ବଦଳେ ଗିଯେ ହେଯେଛିଲ ‘ହ’ । ଫଳେ ସିନ୍ଧୁ ବିଦୌତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଲି ହିନ୍ଦୁସ ନାମେ ପରିଚିତ ହଲୋ । ଆବାର ଗ୍ରିକ ଭାଷାଯ ‘ହ’ ଏର ଉଚ୍ଚାରଣ ନେଇ । ତାର ବିକଳ୍ପ ‘ଇ’ । ଅତଏବ ଯା ଛିଲ ସିନ୍ଧୁ-ହିନ୍ଦୁସ, ତା ଗ୍ରିକ ବିବରଣେ ଅନେକଟା ବଦଳେ ଗିଯେ ‘ହିନ୍ଦିଆ’ ହଲୋ । ତବେ ଖେଲାଲ ରେଖେ, ସେଇସମୟ ହିନ୍ଦିଆ ଶବ୍ଦଟି ସିନ୍ଧୁ ବ-ଦୀପ ଏଲାକାକେଇ ମୂଳତ ବୋଲାତ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟେ ଗ୍ରିକଦେର ବିବରଣୀ ପଡ଼ିଲେ ବୋଲା ଯାଯ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ହିନ୍ଦିଆ ବଲତେ ଉପମହାଦେଶକେଇ ବୋଲାନୋ ହେଯେଛେ । ଉତ୍ତରେ ହିମାଲୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣେ ସମୁଦ୍ର—ଏହି ପ୍ରଧାନ ଦୁଇ ସୀମାନା ସମ୍ପର୍କେ ଗ୍ରିକ ଲେଖକରା ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନ ଛିଲେନ । ବିଦେଶି ତଥ୍ୟସ୍ତବ୍ରେ ଆରେକଟି ନାମ ପାଓୟା ଯାଯ— ‘ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ’ । ଆରବି-ଫାରସି ଭାଷାଯ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନେର କଥା ବାରବାର ଏମେହେ । ୨୬୨ ଖ୍ରିସ୍ଟାବେ ଖୋଦିତ ଇରାନେର ସାମାନୀୟ ଶାସକେର ଏକଟି ଶିଳାଲେଖତେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଶବ୍ଦଟି ପାଓୟା ଯାଯ । ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ସଂଲଙ୍ଘ ଅଞ୍ଚଳକେଇ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହିସାବେ ବୋଲାନୋ ହେଯେଛେ । ଦଶମ ଶତକେର ଶୈଖଭାଗେ ଅଞ୍ଚଳନାମା ଲେଖକ ରଚିତ ହୁଦୁଦ ଅଳ୍ ଆଲମ ଗ୍ରନ୍ଥେ ‘ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ’ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ଭାରତକେ ବୋଲାନୋ ହେଯେଛେ ।

১.৩ ইতিহাসের গুণ-ভাগ

টুকরো কথা

আদি-মধ্যযুগ

রাতারাতি ইতিহাসের যুগ
বদলে যায় না। ধরেো
দুপুরবেলার কথা। সেটা না
সকাল না বিকেল। তেমনই
ভারতের ইতিহাসে একটা

বড়ো সময় ছিলো, যখন
প্রাচীন যুগ থীৱে থীৱে শেষ
হয়ে আসছে আৱ মধ্যযুগও
পুৱেোপুৱি শুৰু হয়নি।
ঐতিহাসিকৱা সেইসময়টিকে
বলেন আদি- মধ্যযুগ।

একটি দিনকে আমৱা ঘণ্টা, মিনিট বা সেকেন্ড দিয়ে ভাগ কৱতে পাৱি।
কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ বছৰকে ভাগ কৱাৰ উপায় কী? ঐতিহাসিকৱা তাই ‘যুগ’
দিয়ে আলাদা কৱেন লম্বা সময়কালকে। সাধাৱণভাৱে ‘প্রাচীন’, ‘মধ্য’ ও
‘আধুনিক’— এই তিন যুগে ইতিহাসের সময়কে ভাগ কৱা হয়। সেই অৰ্থে যে
হাজাৰ বছৰেৰ কথা এখানে আলোচনা কৱা হবে, সেটা মধ্যযুগে পড়ে। কিন্তু
মনে রাখা দৱকাৰ যে, এভাৱে যুগেৰ পাঁচিল তুলে ইতিহাসকে ভাগ কৱা যায়
না। হঠাৎ কৱে কোনো এক দিন সকাল থেকে একটি যুগ শেষ হয়ে আৱ
একটি যুগ শুৰু হয়ে যায় না।

তাহলে কীভাৱে বোৰা যায় কোন সময়টি কোন যুগে পড়বে? আসলে
মানুষেৰ জীবনযাপন, সংস্কৃতি, অৰ্থনীতি, দেশশাসন, যুদ্ধ, পড়াশোনা— এসব
কাজেৰ এক একটি বিশেষ দিক এক এক সময়ে দেখা যায়। সেগুলিৰ তফাত
থেকেই যুগ ভাগ কৱা রেওয়াজ আছে। তাহলে কেমন ছিল মধ্যযুগেৰ ভাৱত?
আগে অনেকে বলতেন, সেসময়ে অন্ধকাৱে ডুবে গিয়েছিল মানুষেৰ জীবন।
কোনো কিছুতেই নাকি কোনো উন্নতি হয়নি। তবে আজকাল আৱ সেকথা
মানা হয় না। টুকৱো টুকৱো উপাদান জুড়ে ঐতিহাসিকৱা সেসময়েৰ ইতিহাস
লিখেছেন। তাতে দেখা যায়, তখন জীবনেৰ নানান দিকে অনেক কিছুৱাই উন্নতি
কৱেছিল ভাৱতেৰ মানুষ। এই বইতে সেসব উন্নতিৰ কথাও তোমৱা জানতে
পাৱবে।

এক দিকে ছিল নানান নতুন যন্ত্ৰ ও কৌশলেৰ ব্যবহাৱ। কুয়ো থেকে
জল তোলা, তাঁত বোনা বা যুদ্ধেৰ অস্ত্ৰ— বিজ্ঞানেৰ ছোঁয়ায় বদলে গিয়েছিল
অনেক কিছুই। অনেক নতুন খাবাৰ ও পানীয়েৰ কথা এই সময় জানতে পাৱে
ভাৱতেৰ লোক। এৱ সবচেয়ে মজাৱ উদাহৱণ হলো রান্নায় আলুৰ ব্যবহাৱ।
পোৰ্তুগিজদেৱ হাত ধৰে এদেশে আলু খাওয়াৰ চল শুৰু হয়।

দেশ শাসনে আৱ রাজনীতিতেও নতুন অনেক দিক দেখা গিয়েছিল।
শুধু রাজ্য বিস্তাৱ নয়, জনগণেৰ ভালো-মন্দেৱ কথাও শাসকদেৱ ভাৱতে
হয়েছিল। কখনও রাজাৱ শাসন নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। আবাৱ কখনও সব
ক্ষমতা একজন শাসকই হাতে তুলে নিয়েছিলেন। অৰ্থনীতিতে একদিকে ছিল
কৃষি, অন্যদিকে ব্যাবসা-বাণিজ্য। তৈৱি হয়েছিল নতুন নতুন শহৱ। বন কেটে
চাষবাস কৱাৰ অনেক উদাহৱণ পাওয়া যায়।

ধৰ্মভাৱনায় বেশ কিছু নতুন পথেৰ হাদিশ সেসময়েৰ মানুষ পেয়েছিল।
আচাৱ-অনুষ্ঠান বা আড়ম্বৰ নয়, ভক্তি দিয়েই ভগবানকে পাওয়াৰ কথা বলা

হয়েছিল। সাধারণ লোকের মুখের ভাষাই হয়ে উঠেছিল ধর্ম প্রচারের মাধ্যম। তার ফলে ভারতের নানান অঞ্চলে আঞ্চলিক অনেক ভাষা এবং সাহিত্যের বিকাশ হয়। পাশাপাশি ছিল নানা ধরনের শিল্পচর্চা।

কিন্তু শিল্প হোক বা সাহিত্য— সবেতেই সাধারণ গরিব মানুষের কথা খুব বেশি ছিল না। সেসবের বেশির ভাগই ছিল শাসকের গুণগানে ভরা। সেগুলোর সঙ্গে জুড়ে থাকতো শাসকের নাম। তাই বলা হয়— চোল রাজারা মন্দির বানিয়েছেন। অথবা তাজমহল বানিয়েছেন সম্রাট শাহজাহান। অসংখ্য সাধারণ কারিগর এবং শিল্পী যারা মন্দিরগুলি এবং তাজমহল বানালেন, তাঁদের বেশির ভাগের নাম আমরা জানি না।

১.৪ ইতিহাসের গোয়েন্দা

ইতিহাস বই পড়তে সবসময় ভালো না লাগলেও, গোয়েন্দা গল্প পড়তে তোমাদের নিশ্চয় ভালো লাগে। আসলে ঐতিহাসিকও একজন গোয়েন্দা। গল্পের গোয়েন্দা টুকরো টুকরো সূত্র (Clue/ক্লু) খুঁজে বের করেন। তারপর যুক্তি দিয়ে সূত্রগুলির ঠিক-ভুল বিচার করেন। শেষে ঘটে যাওয়া ঘটনার সত্য মিথ্যা তুলে ধরেন। তেমনি ঐতিহাসিকও টুকরো টুকরো সূত্র খোঁজেন। সেগুলি যুক্তি দিয়ে বিচার করেন। তারপরে সূত্রগুলি সাজিয়ে অনেককাল আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা বা সময়কে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। আর যেখানে সূত্রের টুকরো পাওয়া যায় না, সেখানে ফাঁক থেকে যায়।

গোটা বছর জুড়ে এই বইটি পড়ার সময়ে তোমরাও এক এক জন ঐতিহাসিক বা গোয়েন্দা হয়ে ওঠো। খুঁটিয়ে দেখো সূত্রগুলি। অনেক জায়গায় ফাঁক আছে। চেষ্টা করো যুক্তি দিয়ে সেগুলির ভরাট করার। খুঁজে দেখো নতুন কোনো সূত্র পাও কি না। তাহলে দেখবে ইতিহাস পড়তে গিয়ে তোমরা এক একজন ইতিহাসের গোয়েন্দা হয়ে উঠেছো। তখন ইতিহাস পড়তে আরো ভালো লাগবে।



ভেবে বলোতো ইতিহাসে
অনেক সময়েই কেন
সাধারণ মানুষ বা কারিগর
ও শিল্পীদের নাম কোথাও
পাওয়া যায় না?





তোমার পাতা

ইতিহাসের গোয়েন্দা হিসাবে হাত পাকানোর জন্য সামনের আটটি অধ্যায় রইল। এই আটটি অধ্যায়ে
যা যা সূত্র পাবে সেসব এই পাতাটায় লিখে রাখো বছর জুড়ে



শ্রীষ্টীয় ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষয়েক্ষণটি ধৰা শ্রীষ্টীয় মন্তম খন্তে দ্বাদশ শতক

আমরা ভারতের অধিবাসী। ভারতের যে অংশে আমরা থাকি তার নাম পশ্চিমবঙ্গ। এই নামটি বেশি দিনের পুরোনো নয়। এই অধ্যায়ে আমরা পড়ব এই জায়গাটি অনেক কাল আগে কী নামে পরিচিত ছিল, এর ভৌগোলিক সীমানা কী ছিল, এর বিভাগগুলি কী ছিল, কারা এখানে শাসন করতেন, এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল ইত্যাদি। এর জন্য আমরা ফিরে যাব অনেক কাল আগের কথায়। সে সময় এই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপন আজকের তুলনায় অনেক আলাদা ছিল।

২.১ প্রাচীন বাংলা

প্রথমে আমরা প্রাচীন বাংলার প্রধান প্রধান ভৌগোলিক বিভাগগুলি সম্বন্ধে জানব। এখানে মনে রাখতে হবে যে এসব হলো এক-দেড় হাজার বছরেরও বেশি আগেকার কথা। এই ভৌগোলিক বিভাগগুলির সীমানা সব সময় এক থাকেনি। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা নানান সময়ে আলাদা-আলাদা ভৌগোলিক বিভাগের অন্তর্গত ছিল।

টুকরো কথা

বঙ্গ, পাখলা, পাখলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ

বঙ্গ নামটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঝুকবেদের ঐতরেয় আরণ্যক-এ। প্রাচীন বাংলায় বঙ্গ বলতে যে অঞ্চলটিকে বোঝানো হতো তা ভৌগোলিকভাবে খুব বড়ো কোনো এলাকা ছিল না। প্রাচীন বাংলার জনপদগুলির মধ্যে বঙ্গ ছিল একটি বিভাগ মাত্র। মহাভারতে বঙ্গ, পুঁড়, সুহ ও তাম্রলিঙ্গ ইত্যাদিকে একেকটি আলাদা রাজ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। কালিদাসের রঘুবংশম কাব্যেও বঙ্গ ও সুহ নামদুটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

শ্রীষ্টীয় ব্রহ্মদেশ শতকের ঐতিহাসিক মিনহাজ ই-সিরাজের লেখাতেও বঙ্গ রাজ্যের কথা আছে। মুঘল যুগের ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর আইন-ই আকবরি গ্রন্থে এই অঞ্চলকে সুবা বাংলা বলে উল্লেখ করেছেন। সুবা মানে প্রদেশ বা রাজ্য।



ঠিকাণ ও প্রতিষ্ঠা



এখনকার পশ্চিমবঙ্গের একটা মানচিত্র নাও। এখন পশ্চিমবঙ্গে কৃষ্ণ জেলা? কোন জেলায় তোমার বাড়ি? সেই জেলাটি ২.১ মানচিত্রের কোথায় হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

যোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ও বণিকরা এখানে এসেছিলেন। তারা এই দেশের নাম দিয়েছিলেন বেঙ্গালা। স্বাধীনতার আগে এই বিরাট ভূখণ্ড বাংলা বা বাংলাদেশ বা বেঙ্গল নামেই পরিচিত ছিল।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগের সময় বাংলার পশ্চিম ভাগের নাম হলো পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীন ভারতের একটা অঙ্গরাজ্য। এই সময় পূর্ব বাংলা চলে গেল নতুন দেশ পাকিস্তানে। পরে তার নাম হলো পূর্ব পাকিস্তান।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন দেশ হলো। তার নতুন নাম হলো বাংলাদেশ।

প্রাচীন বাংলার সীমানা প্রধানত তিনটি নদী দিয়ে তৈরি হয়েছিল। এই নদীগুলি হলো ভাগীরথী, পদ্মা ও মেঘনা (২.১ মানচিত্র দেখো)। বাংলার একেকটি অঞ্চল দীর্ঘকাল ধরে স্বাধীন ছিল। আবার, কয়েকটি অঞ্চল অন্য কোনো অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল। যখন কোনো অঞ্চলের শাসনকর্তা রাজ্যবিস্তার করতেন তখন সেই অঞ্চলের সীমানাও বদলে যেত।

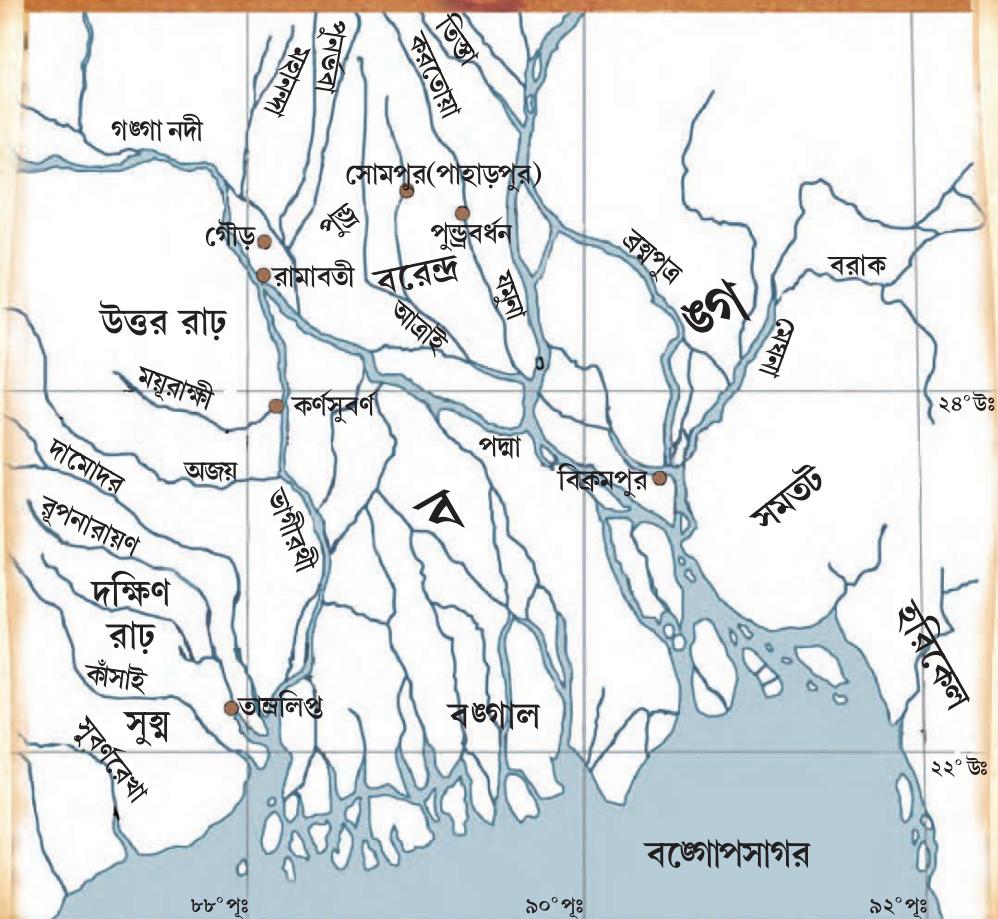
প্রাচীন বাংলার প্রধান অঞ্চলগুলি ছিল পুঁজুবর্ধন, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বঙ্গাল, রাঢ়, সুয়, গৌড়, সমতট ও হরিকেল। সাধারণভাবে কোনো অঞ্চলের অধিবাসীদের নাম অনুসারে জায়গার নাম হতো। বঙ্গ, গৌড়, পুঁজু ইত্যাদি নামগুলি এক একটি জনগোষ্ঠীর নাম। তারা যে অঞ্চলে থাকত, সেই অঞ্চলটির নাম হতো তাদের নাম অনুযায়ী।

পুঁজুবর্ধন : পুঁজুবর্ধন ছিল প্রাচীন বাংলার অঞ্চলগুলির মধ্যে বৃহত্তম। এই অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী এবং পাবনা জুড়ে ছিল। এক সময় শ্রীহট্টও (সিলেট) এর ভিতরে ছিল। গুপ্ত যুগে পুঁজুবর্ধন ছিল একটি ভূক্তি বা শাসন-এলাকা।

বরেন্দ্র : ভাগীরথী ও করতোয়া নদীর মধ্যের এলাকা বরেন্দ্র নামে পরিচিত ছিল।

বঙ্গ : প্রাচীন কালে পদ্মা ও ভাগীরথী নদীর মাঝে ত্রিভুজের মতো দেখতে ব-দ্বীপ এলাকাকে বঙ্গ বলা হতো। সম্ভবত ভাগীরথীর পশ্চিম দিকের এলাকাও এর মধ্যে ছিল। পরবর্তীকালে ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে রাঢ় এবং সুয় নামে দুটো আলাদা অঞ্চলের উৎপন্নি ঘটলে বঙ্গের সীমানাও বদলে যায়। খ্রিস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে বঙ্গ বলতে এখনকার বাংলাদেশের ঢাকা-বিরুমপুর ও বরিশাল অঞ্চলকে বোঝানো হতো।





মানচিত্ৰ ২.১: আদি-মধ্য যুগে বাংলা (আনুমানিক ৬০০-১২০০ খ্রি:)

বঙ্গাল : বঙ্গাল অঞ্চল বলতে বঙ্গের দক্ষিণ সীমানাবতী বঙ্গোপসাগরের উপকূলকে চিহ্নিত করা হতো।

রাত-সুস্থ : প্রাচীন রাত বা লাত অঞ্চলের দুটি ভাগ ছিল। উত্তর রাত এবং দক্ষিণ রাত। জৈনদের প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে উত্তর রাত ছিল বজ্রভূমি (বজ্রভূমি) এবং দক্ষিণ রাত ছিল সুব্রহ্মভূমি (সুস্থভূমি) এলাকা। উত্তর এবং দক্ষিণ রাতের মাঝের সীমানা ছিল অজয় নদ। আজকের মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিম ভাগ, বীরভূম জেলা, সাঁওতাল পরগনার একাংশ এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার উত্তর ভাগ ছিল উত্তর রাত অঞ্চল। দক্ষিণ রাত বলতে আজকের হাওড়া, হুগলি এবং বর্ধমান জেলার বাকি অংশ এবং অজয় ও দামোদর নদের মধ্যবর্তী বিরাট এলাকাকে বোঝানো হতো। দক্ষিণ রাত ছিল বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী এলাকা। মহাভারতের গল্পে এবং কালিদাসের কাব্যে আছে যে ভাগীরথী এবং কঁসাবতী (কঁসাবতী) নদীর মাঝে সমুদ্র পর্যন্ত বিরাট এলাকা এর অন্তর্গত ছিল।

ঠিকাণ ও প্রতিষ্ঠা

গোড় : প্রাচীন এবং মধ্য যুগের বাংলায় গোড় ছিল গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। গোড় বলতে একটি জনগোষ্ঠীকেও বোঝানো হতো। বরাহমিহিরের (খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক) রচনা অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং বর্ধমান জেলার পশ্চিম ভাগ নিয়ে তৈরি হয়েছিল সেকালের গোড়।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে রাজা শশাঙ্কের আমলে গোড়ের সীমা বেড়ে গিয়েছিল। শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুর্বণ। ভাগীরথীর পশ্চিম পারে আজকের মুর্শিদাবাদ জেলাই ছিল সেকালের গোড়ের প্রধান এলাকা। শশাঙ্কের আমলে পুঁত্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ) থেকে ওড়িশার উপকূল পর্যন্ত এলাকা গোড়ের অন্তর্গত হয়েছিল। খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে গোড় বলতে সমগ্র পাল সাম্রাজ্যকেও বোঝানো হতো।

সমতট : প্রাচীন সমতট ছিল মেঘনা নদীর পূর্ব দিকের এলাকা। বর্তমানে বাংলাদেশের কুমিল্লা-নোয়াখালি অঞ্চলের সমভূমিকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত ছিল প্রাচীন সমতট অঞ্চল। মেঘনা নদী সমতটকে বাংলার বাকি অঞ্চলের থেকে আলাদা করে রেখেছিল। এই কারণে সমতটকে প্রাচীন ইতিহাসে বাংলার সীমান্তবর্তী এলাকা বলে ধরা হতো।

হরিকেল : সমতটের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আজকের বাংলাদেশের চট্টগ্রামের উপকূল অঞ্চল প্রাচীন যুগে হরিকেল নামে পরিচিত ছিল।

এবারে আসা যাক বাংলার প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা শশাঙ্কের কথায়।

২.২ শশাঙ্ক

শশাঙ্ক ছিলেন এক গুপ্ত সন্ধাটের মহাসামন্ত। ৬০৬-'০৭ খ্রিস্টাব্দের কিছু কাল আগে তিনি গোড়ের শাসক হন। শশাঙ্কের শাসনের ষাট-সত্ত্বর বছর আগে থেকেই গোড় থারে রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। শশাঙ্কের আমলে গোড়ের ক্ষমতা আরও বেড়েছিল। ৬৩৭-'৩৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত শশাঙ্ক গোড়ের স্বাধীন শাসক ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুর্বণ।

শশাঙ্কের শাসনকালে উত্তর ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তি (মানব, কনৌজ, স্থানীশ্বর বা থানেসর, কামরূপ, গোড় প্রভৃতি) নিজ-নিজ স্বার্থে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বা মেত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখত। শশাঙ্ক সেই দ্বন্দ্বে অংশ নেন। সেভাবে উত্তর-পশ্চিম বারাণসী পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব ছড়িয়ে পড়েছিল। শশাঙ্কের সমগ্র গোড় দেশ, মগধ-বুদ্ধগয়া অঞ্চল এবং ওড়িশার একাংশ নিজের অধিকারে আনতে পেরেছিলেন। উত্তর ভারতের ক্ষমতাধর রাজ্যগুলির সঙ্গে লড়াই করে শশাঙ্ক গোড়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন। এই ঘটনা তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়।



রাঢ় অঞ্চল বলতে
এখনকার পশ্চিমবঙ্গের
কেন অঞ্চলকে বোঝায়?
সেই অঞ্চলে কী কী নদী
আজও আছে?



টুকরো কথা

কর্ণসুবর্ণ : ধাচীন পাখলাব নগর

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার চিরুটি (বর্তমান নাম কর্ণসুবর্ণ) রেলস্টেশনের কাছে রাজবাড়িডাঙ্গায় পাচীন রক্তমৃতিকা (রাঙামাটি) বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। চিনা বৌদ্ধ পর্যটক হিউয়েন সাঙ্গের বিবরণীতে এর উল্লেখ আছে। এর কাছেই ছিল সেকালের গৌড়ের রাজধানী শহর কর্ণসুবর্ণ। চিনা ভাষায় এই বৌদ্ধবিহারের নাম লো-টো-মো-চিহ। সুয়ান জাং তাম্রলিপ্ত (আধুনিক তমলুক) থেকে এখানে এসেছিলেন। কর্ণসুবর্ণ স্থানীয় ভাবে রাজা কর্ণের প্রাসাদ নামে পরিচিত।

সুয়ান জাং লিখেছেন যে, এই দেশটি জনবহুল এবং এখানকার মানুষেরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এখানে জমি নীচ ও আদ্র, নিয়মিত কৃষিকাজ হয়, অচেল ফুল-ফল পাওয়া যায়, জলবায়ু নাতশীতোষ্ণ এবং এখানকার মানুষজনের চরিত্র ভালো ও তাঁরা শিক্ষাদীক্ষার পৃষ্ঠপোষক। কর্ণসুবর্ণে বৌদ্ধ এবং শৈব উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই বসবাস করত।

কর্ণসুবর্ণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র ও প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। আশ-পাশের গ্রাম থেকে এখানকার নাগরিকদের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আসত। শশাঙ্কের আমলের অনেক আগে থেকেই সম্ভবত এই অঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। রক্তমৃতিকা থেকে জনেক বণিক জাহাজ নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয় অঞ্চলে বাণিজ্য করতে গিয়েছিল এমন নিদর্শনও পাওয়া গেছে। এর থেকে কর্ণসুবর্ণের বাণিজ্যিক সম্বন্ধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

কর্ণসুবর্ণের রাজনীতিতে পালাবদল ঘটেছে বারবার। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে এই শহর অঙ্গ সময়ের জন্য কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মার হাতে চলে যায়। এর পর কিছু কাল এটি জয়নাগের রাজধানী ছিল। তবে সপ্তম শতকের পরে এই শহরের কথা আর বিশেষ জানা যায় না। পাল এবং সেন যুগের ইতিহাসের উপাদানগুলিতে এর কোনো উল্লেখ নেই।



শশাঙ্কের রাজনৈতিক জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্থানীক্ষণের পুষ্যভূতি বংশীয় শাসক হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর দ্঵ন্দ্ব। সকলোভরপথনাথ উপাধিধারী হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে হারাতে পারেননি।

টুকরো কথা

গৌড়গঠন (গৌড়গঠ)

কনৌজের শাসক যশোবর্মা বা যশোবর্মনের রাজকবি বাকপত্রিভাজ ৭২৫-’৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ প্রাকৃত ভাষায় গৌড়বহো কাব্য রচনা করেছিলেন। যশোবর্মন মগধের রাজাকে পরাজিত করার পর কবি এই কাব্য রচনা করেছিলেন। মনে হয় যে, মগধের রাজা বলতে গৌড়ের রাজাকেই বোঝানো হয়েছে।

শশাঙ্ক ধর্মীয় বিশ্বাসে ছিলেন শৈব বা শিবের উপাসক। আর্যমঞ্চে শ্রীমূলকল্প নামক বৌদ্ধ প্রান্তে এবং সুয়ান জাঁ-এর অ্রমণ বিবরণীতে তাঁকে ‘বৌদ্ধবিদ্বেষী’ বলা হয়েছে। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হত্যা করেছিলেন এবং বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় স্মারক ধ্বংস করেছিলেন। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্টের রচনা হর্ষচরিত-এ শশাঙ্ককে নিন্দা করা হয়েছে।

অন্যদিকে শশাঙ্কের শাসনকালের কয়েক বছর পরে সুয়ান জাঁ-কণ্ঠসূর্য নগরের উপকণ্ঠে রক্তমৃত্তিকা বৌদ্ধবিহারের সমৃদ্ধি লক্ষ করেছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর চিনা পর্যটক ই-ৎসিঙ্গ-এরও নজরে পড়েছিল বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি। শশাঙ্ক নির্বিচারে বৌদ্ধবিদ্বেষী হলে তা হতো না। বলা যায় যে, শশাঙ্কের প্রতি সব লেখকরা পুরোপুরি বিদ্বেষমুক্ত ছিলেন না। সুতরাঁ, শশাঙ্ক সম্পর্কে তাঁদের মতামত কিছুটা অতিরিক্ত ছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

শশাঙ্কের শাসনকালে গৌড়ে যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তাকে বলা যায় গৌড়তন্ত্র। এই ব্যবস্থায় রাজ্যের কর্মচারী বা আমলারা একটা নির্দিষ্ট শাসনপ্রণালী গড়ে তুলেছিল। আগে যা ছিল প্রামের স্থানীয় লোকের কাজ, শশাঙ্কের সময় সেই কাজে প্রশাসনও হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। অর্থাৎ, এ আমলের গৌড় রাজ্যে কেন্দ্রীয় ভাবে সরকার পরিচালনা করা হতো।

শশাঙ্কের আমলে সোনার মুদ্রা প্রচলিত ছিল (২.২ ছবি দেখো)। কিন্তু তার মান পড়ে গিয়েছিল। নকল সোনার মুদ্রাও দেখা যেত। বুপোর মুদ্রা ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই যুগে সন্তুষ্ট মন্দা দেখা দিয়েছিল। সমাজে জমির চাহিদা বাড়তে থাকে। অর্থনীতি হয়ে পড়ে কৃষিনির্ভর। বাণিজ্যের গুরুত্ব কমে যাওয়ার ফলে নগরের গুরুত্ব কমতে শুরু করে। আবার কৃষির গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ায় সমাজ ক্রমশ প্রামকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল। সমাজে মহত্তর বা স্থানীয় প্রধানদের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। শ্রেষ্ঠী বা বণিকদের গুরুত্ব ও ক্ষমতা আগেকার যুগের থেকে কমে এসেছিল। স্থানীয় প্রধানরা এ যুগে শ্রেষ্ঠীদের মতোই ক্ষমতাধর হয়ে উঠেছিল।

এ যুগে বঙ্গ এবং সমতটের শাসকরা প্রায় সকলেই ছিল ব্রাহ্মণ ধর্মের অনুরাগী। বিষ্ণু, কৃষ্ণ এবং শিব পুজোর প্রথা ছিল। খ্রিস্টীয় যষ্ঠ এবং সপ্তম শতকের অধিকাংশ সময় জুড়ে বৌদ্ধধর্ম বাংলার রাজাদের সমর্থন পায়নি। পরবর্তীকালে (খ্রিস্টীয়



ছবি : ২.২ শশাঙ্কের মুদ্রা

অষ্টম-নবম শতকে পাল আমলে) বৌদ্ধধর্ম আবার রাজার সমর্থন পেয়েছিল।

শশাঙ্ক কোনো স্থায়ী রাজবংশ তৈরি করে যেতে পারেননি। ফলে তাঁর মৃত্যুর পর গৌড়ের ক্ষমতা নষ্ট হয়। বাংলায় নানা বিশৃঙ্খলা দেখা গিয়েছিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর বছর দশেক পরে হর্ষবর্ধনও মারা যান। বাংলার নানা অংশ প্রথমে কামরূপের রাজা এবং পরে নাগ সম্প্রদায়ের জয়নাগ এবং তিব্বতের শাসকরা অধিকার করেন। অষ্টম শতকে কনৌজ এবং কাশ্মীরের শাসকরা বাংলা আক্রমণ করেছিলেন। বাংলার ইতিহাসে এই বিশৃঙ্খল সময়কে বলা হয় মাংস্যন্যায়ের যুগ।



তোমার চেনা কোনো
পশুর ছবি কি ২.২-এর
মুদ্রায় দেখতে পাচ্ছ? কেন
ঐ পশুর ছবি এই মুদ্রায়
আছে বলে মনে হয়?

টুকরো কথা

মাংস্যন্যায়

মাংস্যন্যায় বলতে দেশে অরাজকতা বা স্থায়ী রাজার অভাবকে বোঝানো হয়। পুরুরের বড়ো মাছ যেমন ছোটো মাছকে খেয়ে ফেলে, অরাজকতার সময়ে তেমনি শক্তিশালী লোক দুর্বল লোকের ওপর অত্যাচার করে।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগ থেকে অষ্টম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত একশো বছর ছিল বাংলার ইতিহাসে একটা পরিবর্তনের যুগ। ঐ যুগে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, সন্ত্রাস লোক, ব্রাহ্মণ এবং বণিক ইচ্ছামতো নিজের নিজের এলাকা শাসন করত। বাংলায় কোনো কেন্দ্রীয় শাসক ছিল না।

বছরের পর বছর এই অবস্থা চলার পরে বাংলার প্রভাবশালী লোকেরা মিলে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে গোপাল নামে একজনকে রাজা নির্বাচন করে (আনুমানিক ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ)। ঐ সময় থেকে বাংলায় পাল বংশের রাজত্ব শুরু হয়।



২.৩ বাংলার পাল রাজাদের শাসনকাল : খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতকের মুচ্চনা পর্যন্ত

টুকরো কথা

পাল রাজাদের তাত্ত্বিক

মালদহ জেলার হবিবপুর ইউনিয়নের জগজ্জীবন পুরে পালবুগের একটি বৌদ্ধবিহার আবিস্থিত হয়েছে কয়েক বছর আগে। সেখানে পাওয়া তামার লেখ থেকে জানা গেছে যে দেবপালের পরে তার বড়ে ছেলে মহেন্দ্রপাল রাজা হয়েছিলেন (৮৪৫-'৬০ খ্রিঃ)। আগে ভাবা হতো যে মহেন্দ্রপাল ছিলেন পশ্চিম ভারতের প্রতিহার বংশের রাজা। মহেন্দ্রপালের কথা জানার পরে দেবপাল-পরবর্তী পাল রাজাদের শাসন কালের তারিখ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বদলে গেছে।



পাল রাজাদের আদি নিবাস ছিল সম্ভবত বরেন্দ্র অঞ্চলে। পাল শাসনের প্রথম একশো বছর (খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগ থেকে নবম শতকের মধ্যভাগ) তাদের ক্ষমতা বিস্তারের সময়। এর পরের প্রায় একশো তিরিশ বছর ধরে (খ্রিস্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগ থেকে দশম শতকের শেষভাগ) পালদের ক্ষমতা কমতে থাকে। আবার, দশম শতকের শেষ দিক থেকে পালদের ক্ষমতা অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল (আনুমানিক ৭৫০-'৭৪ খ্রিঃ)। বাংলার অধিকাংশ এলাকাকে তিনি নিজের শাসনের আওতায় এনেছিলেন। গোপালের উত্তরাধিকারী ধর্মপাল (আনুমানিক ৭৭৪-৮০৬ খ্�রিঃ) উত্তর ভারতের কনৌজকে কেন্দ্র করে যে ত্রিশক্তি সংগ্রাম চলেছিল তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ধর্মপালের ছেলে দেবপাল (আনুমানিক ৮০৬-'৪৫ খ্�রিঃ) উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য রাজাদের মতোই সাম্রাজ্য বিস্তার করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে অস্তত বিশ্বপর্বত পর্যন্ত এবং উত্তর-পশ্চিমে কঙ্কালদেশ থেকে পূর্বে প্রাগজ্যোতিষপুর পর্যন্ত পাল সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল।

দেবপালের পরে পালদের ক্ষমতা কমতে শুরু করে। এর কারণ ছিল পালদের নিজেদের মধ্যে গোলমাল। এ ছাড়া, দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট, পশ্চিম ভারতের প্রতিহার এবং ওড়িশার শাসকরা নবম শতকে বাংলা এবং বিহারের অনেক এলাকা জয় করেছিল। বাংলায় পালদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাদের রাজ্য মগধ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। আবার, রাজা প্রথম মহীপালের সময় (আনুমানিক ৯৭৭-১০২৭ খ্রিঃ) পালশাসনের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হয়েছিল।

একাদশ শতকের শেষ দিকে রামপাল রাজা হন (আনুমানিক ১০৭২-১১২৬ খ্রিঃ)। কৈবর্ত বিদ্রোহের ফলে বরেন্দ্র অঞ্চল পালদের হাতের বাইরে চলে গিয়েছিল। রামপাল তা উদ্ধার করতে সফল হন। তিনি পালদের ক্ষমতাকে কিছুটা রক্ষা করতে পেরেছিলেন। রামপালের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই বাংলায় পালরাজত্ব কার্যত শেষ হয়ে যায়।

পাল আমলের শাসনব্যবস্থায় সামন্ত নেতাদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই সব সামন্ত নেতাদের পাল আমলের বিবরণীগুলিতে রাজন, সামন্ত, মহাসামন্ত ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। কৈবর্ত বিদ্রোহের সময় এরা বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল।

টুকরো কথা

ক্ষেপণ বিদ্রোহ

পালশাসনে একাদশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে বাংলায় কৈবর্ত বিদ্রোহ ঘটেছিল। কৈবর্তেরা ছিল সঙ্গীত নৌকার মাঝি বা জেলে। সে সময়ে বাংলার উত্তর ভাগে কৈবর্তদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সম্ব্যাক্ত নদীর রামচরিত কাব্যে কৈবর্ত বিদ্রোহের বিবরণ আছে। এই বিদ্রোহের তিনজন নেতা ছিলেন: দিব্য (দিবেৰোক), বুদ্ধেক এবং ভীম। দ্বিতীয় মহীপালের শাসনকালে (আনুমানিক ১০৭০-৭১ খ্রিঃ) দিব্য ছিলেন পালরাষ্ট্রেই কর্মচারী। পালদের দুর্বলতার সুযোগে তিনি বিদ্রোহ করেন। মহীপাল বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে নিহত হন। দিব্য বরেন্দ্র দখল করে সেখানকার রাজা হয়ে বসেন। এই বিদ্রোহ কত বড়ো আকার ধারণ করেছিল, বা দিব্যের সঙ্গে কতজন সামন্ত যোগ দিয়েছিল সে সম্বন্ধে বিশদ জানা যায় না। মহীপালের ছেটো ভাই রামপাল দিব্যকে দমন করে বরেন্দ্র উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি। কৈবর্ত রাজা ভীমও জনপ্রিয় শাসক ছিলেন। এ সময়ে পাল রাজাদের শাসন উত্তর বিহার ও উত্তর-পশ্চিম বাংলায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। রামপাল বাংলা এবং বিহারের বিভিন্ন সামন্ত-নায়কদের সাহায্য নিয়ে ভীমকে পরাজিত এবং হত্যা করেন। তারপর তিনি বরেন্দ্র-সহ বাংলার কামরূপ এবং ওড়িশার একাংশে পাল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। বরেন্দ্র অঞ্চলে রামাবতী নগরে রামপালের রাজধানী স্থাপিত হয়। এই বিদ্রোহ পাল শাসনের শেষ দিকে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা স্পষ্ট করে দিয়েছিল। কৈবর্ত বিদ্রোহের কথা জানা যায় রামচরিত কাব্য থেকে। এ সম্বন্ধে আমরা পরের অধ্যায়ে পড়ব।

২.৪ বাংলায় সেন রাজাদের শাসনকাল

বাংলার সেন রাজারা খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে শাসন শুরু করেছিলেন। এয়োদশ শতক শুরু হওয়ার অক্ষণ কয়েক বছরের মধ্যে সেন শাসন শেষ হয়ে যায়।

সেন রাজাদের আদি বাসস্থান ছিল দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট অঞ্চল, অর্থাৎ মহীশূর এবং তার আশেপাশের এলাকা। সেনরা বৎসরতভাবে প্রথমে ছিলেন ব্রাহ্মণ, পরে তাঁরা ক্ষত্রিয় হয়ে যান। সেন বৎসরের সামন্তসেন একাদশ শতকের কোনো এক সময়ে কর্ণাট থেকে রাঢ় অঞ্চলে চলে এসেছিলেন। সামন্তসেন এবং তাঁর ছেলে হেমন্তসেনের আমলে রাঢ় অঞ্চলে সেনদের কিছুটা আধিপত্য তৈরি হয়েছিল। হেমন্তসেনের ছেলে বিজয়সেন (আনুমানিক ১০৯৬-১১৫৯ খ্রিঃ) রাঢ়, গোড়, পূর্ব বঙ্গ এবং মিথিলা জয় করে সেন-রাজ্যের পরিধি বাড়িয়েছিলেন।



ঠিতীত ও প্রতিষ্ঠা

পরবর্তী শাসক বল্লালসেন (আনুমানিক ১১৫৯-’৭৯ খ্রি) পাল রাজা গোবিন্দপালকে পরান্ত করেছিলেন। এভাবে বল্লালসেন পালরাজত্বের ওপর চূড়ান্ত আঘাত করেন। বল্লালসেন সমাজ-সংস্কার করে রক্ষণশীল, গেঁড়া ব্রাহ্মণ আচার-আচরণকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বল্লালসেনের ছেলে এবং উত্তরাধিকারী লক্ষ্মণসেন (আনুমানিক ১১৭৯-১২০৪/৫ খ্রি) প্রয়াগ, বারাণসী এবং পুরীতে তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে। লক্ষ্মণাবতী (গোড়) ছিল ওই আমলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। ১২০৪/৫ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি আক্রমণ ঘটলে বাংলায় সেন শাসনের কার্যত অবসান ঘটেছিল।

ছক ২.১ : এক নজরে বাংলা ও বিহারে পাল ও সেন রাজাদের শাসন

রাজবংশ	সময়কাল	কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শাসক	উল্লেখযোগ্য ঘটনা
পাল	৭৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ	গোপাল, ধর্মপাল, দেবপাল, প্রথম মহীপাল, রামপাল	ত্রিশক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ, বৌদ্ধ ধর্মের প্রস্তাবণা, শিক্ষা-শিল্প-স্থাপত্যের বিকাশ, কৈবর্ত বিদ্রোহ
সেন	খ্রিস্টীয় একাদশ শতক-১২০৪/৫ খ্রিস্টাব্দ (খ্রিস্টীয় অযোদ্ধা শতকের প্রথম ভাগ)	বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন	বর্ণ ব্যবস্থার কড়াকড়ি, তুর্কি অভিযান

লক্ষ করে দেখো যে, পাল রাজাদের শাসনের শেষ দিকেই বাংলায় সেন শাসন শুরু হয়। তার মানে হলো, খ্রিস্টীয় একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে সমগ্র বাংলার উপরে আর পাল রাজাদের কর্তৃত তেমন ভাবে ছিল না। কেবল পূর্ব বিহারে এবং উত্তর বাংলায় পাল রাজাদের শাসন টিকে ছিল। এই সুযোগে সেন বংশের সামন্তসেন এবং তাঁর ছেলে হেমন্তসেন রাঢ় অঞ্চলে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাল শাসনের শেষ দিকে কৈবর্ত বিদ্রোহ সেনদের রাজ্যস্থাপনে সাহায্য করেছিল।

২.৪ অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির উত্থান

এতক্ষণ আমরা বাংলার কথা পড়লাম। বাংলার বাইরে খ্রিস্টীয় সপ্তম এবং অষ্টম শতাব্দীতে উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতে বেশ কিছু নতুন রাজবংশ এবং রাজত্বের উত্থান হয়েছিল। এই নতুন রাজবংশগুলি স্থানীয় শক্তিশালী

ব্যক্তিদের উপস্থিতি মেনে নিয়েছিল। বড়ো বড়ো জমির মালিক বা যোদ্ধানেতাদের অনেক ক্ষেত্রে সামন্ত, মহাসামন্ত বা মহা-মণ্ডলেশ্বর ইত্যাদি উপাধি দেওয়া হতো। তার বদলে এঁরা রাজা বা উর্ধ্বর্তন কর্তৃপক্ষকে খাজনা ও উপতোকন দিত। এমনকি প্রয়োজনে রাজার ডাকে সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে হাজির হতো। কখনও আবার এদের মধ্যে কেউ কেউ রাজার দুর্বলতার সুযোগে স্বাধীনভাবে নিজেদের অঞ্চল শাসন করতে শুরু করেছিল। যেমন, দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূটরা কর্ণটকের চালুক্যশক্তির অধীন ছিল। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এক রাষ্ট্রকূট নেতা দন্তিদুর্গ চালুক্য শাসককে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে নিজেই স্বাধীন রাজা হয়ে বসেন। অনেক সময় সামরিক কৃতিত্বের অধিকারী মানুষেরা পারিবারিক শক্তির সাহায্যে নতুন রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হতো। এইরকম কয়েকটি রাজবংশের কথা এখানে আমরা জানব।

প্রথমে উত্তর ভারত দিয়ে শুরু করা যাক। বাংলা, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পাল রাজারা রাজত্ব করতেন। এদের কথা আমরা আগেই জেনেছি। দ্বিতীয় শক্তি ছিল গুর্জর-প্রতিহার। এঁরা রাজস্থান ও গুজরাটের বহু অঞ্চল শাসন করতেন। এদের মধ্যে রাজা ভোজ (৮৩৬-৮৫ খ্রিস্টাব্দ) খুব ক্ষমতাবান ছিলেন। তিনি কনৌজ দখল করে তাঁর রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে, বহু আক্রমণের মুখে প্রতিহাররা দুর্বল হয়ে পড়ে।

হর্ষবর্ধনের সময় থেকেই কনৌজ উত্তরাপথের অবস্থানগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। যে কনৌজ নিয়ন্ত্রণ করবে সেই গাঙ্গেয় উপত্যকা দখলে রাখতে পারবে তা বোঝা গিয়েছিল। এই অঞ্চলের নদী-ভিত্তিক বাণিজ্য এবং খনিজ দ্রব্য আর্থিক দিক থেকে লোভনীয় ছিল। কনৌজ শেষ পর্যন্ত কে দখলে রাখতে পারবে, এই নিয়ে অষ্টম শতাব্দী থেকে পাল, গুর্জর-প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকূট বংশের মধ্যে টানা লড়াই চলেছিল। একেই দ্বি-শক্তি সংগ্রাম বলা হয়। প্রায় দুশো বছর ধরে চলা যুদ্ধ-কলাহে তিনটি বংশেরই শক্তি শেষ হয়ে যায়। এই সময়ে পাল রাজাদের ক্ষমতা কমে গেলে বাংলায় সেন রাজত্ব শুরু হয়েছিল।

২.৬ দক্ষিণ ভারতের চোল শক্তি

এই সময়ে দক্ষিণ ভারতেও বেশ কিছু আঞ্চলিক শক্তির বিকাশ হয়েছিল। পল্লব, পাণ্ডি এবং বিশেষত চোলরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। কাবেরী এবং তার শাখানদীগুলির ব-দ্বীপকে ঘিরে চোল রাজ্য গড়ে উঠেছিল। সেখানকার রাজা মুট্টাবাইয়াকে সরিয়ে বিজয়ালয় (৮৪৬-৮৭১ খ্রিঃ) চোল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। থাঞ্ছাভুর বা তাঞ্জ্বির নামে এক নতুন নগরী তৈরি হয় যা চোলদের

টুকরো কথা

রাজপুত

উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে যাদের কথা বারবার বলা হয় তারা হলো রাজপুত। রাজপুত কারা, এদের দেশ কোথায়—এসব নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক আছে। অনেকে মনে করেন খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে হুগদের আক্রমণের পরে বেশ কিছু মধ্য- এশীয় উপজাতির মানুষ উত্তর- পশ্চিম ভারতে বসবাস করতে থাকে। স্থানীয়দের সঙ্গে তাদের বিবাহও হয়। এদের বংশধরদের রাজপুত বলা হয়। তবে রাজপুতরা নিজেদেরকে স্থানীয় ক্ষত্রিয় বলে মনে করত। নিজেদের চন্দ, সূর্য বা অগ্নি দেবতার বংশধর বলে মনে করত তারা।

রাজধানী ছিল। বিজয়ালয়ের উত্তরসূরিরা রাজ্যকে আরো সম্প্রসারিত করেন। দক্ষিণের পাঞ্জ এবং উত্তরের পল্লব অঞ্চল চোলদের দখলে আসে। ১৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম রাজরাজ বর্তমান ক্রেল, তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চোল প্রতিপত্তি বাঢ়ান। তাঁর পুত্র প্রথম রাজেন্দ্র (১০১৬-১০৪৪ খ্রিঃ) কল্যাণীর চালুক্যশক্তিকে পরাজিত করেন। বাংলার পালবংশের বিরুদ্ধে এক অভিযানে গঙ্গা নদীর তীরে পালরাজাকে হারিয়ে তিনি গঙ্গাইকোণ্ডচোল উপাধি নেন। প্রথম রাজরাজ এবং রাজেন্দ্র চোল দুজনেই দক্ষ নৌবাহিনী তৈরি করেন। তার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতীয় বাণিজ্যকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা চোলদের পক্ষে সম্ভব হয়।

মানচিত্র : ২.২ : খ্রিস্টীয় নবম শতকের ভারতবর্ষ



২.৭ ইসলাম ও ভারত

এতক্ষণ আমরা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের কিছু কথা পড়লাম। এই সময়েই ভারতের সঙ্গে ইসলামীয় সভ্যতার যোগাযোগ ঘটেছিল। ভারতের রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির উপর এই যোগাযোগের গভীর প্রভাব পড়েছিল।

ভারতের পশ্চিমে আরব সাগর পেরিয়ে এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম ভাগে আরব উপদ্বীপ। আরব উপদ্বীপের অধিকাংশই মরুভূমি বা শুকনো ঘাসজমি অঞ্চল। এর পশ্চিমে লোহিত সাগর, দক্ষিণে আরব সাগর এবং পূর্বদিকে পারস্য উপসাগর। এখানে বৃষ্টিপাত সামান্যই হয়। মুক্তা এবং মদিনা এখানকার দুটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। এখানকার যায়াবর মানুষদের বলা হতো বেদুইন। তারা উট পালন করত। খেজুর এবং উটের দুধ ছিল এদের অন্যতম খাদ্য। এই মানুষেরা নিজেদের আরব বলে পরিচয় দিত।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের শুরুতে, কিছু কিছু আরব উপজাতি ব্যবসাকেই প্রধান জীবিকা করেছিল। মুক্তা শহর দুটি বাণিজ্যপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এই নগরের দখলদারি নিয়ে বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই থাকত। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরব উপদ্বীপে নতুন এক ধর্মের জন্ম হলো। তার নাম ইসলাম। এই শতকে হজরত মহম্মদ মুক্তাকে কেন্দ্র করে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে শুরু করেন। তিনি নিজেও ছিলেন একজন ব্যবসায়ী।

হজরত মহম্মদ ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৬১০ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘোষণা করেন যে আল্লাহ বা ঈশ্঵র তাঁকে দৃত মনোনীত করেছেন। সে জন্যই মহম্মদকে ঈশ্বর বা আল্লাহর বার্তাবাহক বলা হয়। আল্লাহর বাণী সাধারণ মানুষ মহম্মদের থেকেই জানতে পারেন। ইসলাম ধর্মের অনুগামীরা মুসলমান নামে পরিচিত।

বিভিন্ন আরব উপজাতিদের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদ বন্ধ করার জন্য মহম্মদ একটি বিশ্বাসকেই চালু করেছিলেন। ফলে উপজাতিগুলির মধ্যে ঐক্য তৈরি হতে থাকে। তখনকার দিনে প্রতিষ্ঠিত মুক্তাবাসীদের ধর্মীয় আচার আচরণের সাথে মহম্মদের ধর্মীয় মতের যথেষ্ট ফারাক ছিল। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ এবং তাঁর অনুগামীরা মদিনা শহরে চলে আসেন। মুক্তা থেকে মদিনায় এই চলে যাওয়াকে আরবি ভাষায় হিজরত বলা হয়। পরে ঐ সময় থেকে হিসাব করেই হিজরি নামেই ইসলামীয় সাল গণনা শুরু হয়। দশ বছরের মধ্যেই মহম্মদ আরব ভূখণ্ডের বিরাট অঞ্চল জয় করেন। মুক্তাতেও তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হজরত মহম্মদ পরলোক গমন করেন। ততদিনে অবশ্য আরবের মূল ভূখণ্ডে ইসলাম ভালোভাবেই ছড়িয়ে পড়েছিল।

টুকরো কথা

ভারত ৩ আরব মুসলিম

ভারতের সঙ্গে ইসলামের প্রথম যোগাযোগ ঘটেছিল তুর্কি এদেশে আসার অনেক আগে থেকেই। খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে আরব বণিকরা ভারতের পশ্চিম উপকূলে আসতেন। সিন্ধু মোহনায়, মালাবারে আরবি মুসলিম বণিকদের বসতি গড়ে উঠেছিল। এর থেকে যেমন আরবি বণিকরা লাভবান হয়েছিল, তেমনি স্থানীয় ব্যবসায়ীরা লাভ করত। শাসকরাও এর থেকে লাভবান হয়েছিল। হিন্দু, জৈন এবং মুসলিম বণিকদের এই বাণিজ্য ধর্মীয় সহিযুক্তার এক উজ্জ্বল নির্দর্শন।

এই যুগে বাগদাদের খলিফাদের উদ্যোগে সংস্কৃত ভাষায় রচিত জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য ইত্যাদি আরবি ভাষায় অনুদিত হয়েছিল।

ତୁରକରୋ କଥା

ଖଲିଫା ଓ ଖିଲାଫ୍

ମହମ୍ମଦର ପର ଇସଲାମ ଜଗତେର ନେତୃତ୍ବ କେ ଦେବେନ— ତା ନିଯେ ପ୍ରକ୍ଷଣ ଓଠେ । ତଥାମହମ୍ମଦର ପ୍ରଧାନ ଚାର ସଙ୍ଗୀରା ଏକେ ଏକେ ମୁସଲମାନଦେର ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହନ । ଏଦେର ବଳା ହ୍ୟ ଖଲିଫା । ଖଲିଫା ଶବ୍ଦଟା ଆରବି । ତାର ମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ । ପ୍ରଥମ ଖଲିଫା ଛିଲେନ ଆବୁ ବକର । ଖଲିଫାଇ ହଲେନ ଇସଲାମୀୟ ଜଗତେର ରାଜନୈତିକ ଓ ଧର୍ମୀୟ ନେତା । ଯେସବ ଅଞ୍ଚଳେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର କ୍ଷମତା ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼େଛେ, ସେଗୁଣି ହଲୋ ଦାର-ଉଲ ଇସଲାମ । ଖଲିଫା ଏହି ପୂରୋ ଦାର-ଉଲ ଇସଲାମେର ପ୍ରଧାନ ନେତା । ତାର ଅଧିକାରେର ଅଞ୍ଚଳେର ନାମ ଖିଲାଫ୍ ।

ତୁରକରୋ କଥା

କୋଣାନ ଓ କାରା

ଇସଲାମେର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ହଲୋ କୋରାନ । ମୁସଲମାନରା ବିଶ୍ୱାସ କରେନ ଯେ କୋରାନ ଆଜ୍ଞାହର ବାଣୀ ।

ମର୍କ୍କାଯ ମସଜିଦ-ଇ ହରମ ନାମେ ଏକଟି ମସଜିଦ ଆଛେ ।

ଏହି ମସଜିଦେର ମାବାଖାନେ କାବା ନାମେ ଏକଟି ପବିତ୍ର ଭବନ ଆଛେ । ଏରଇ ଆରେକ ନାମ ବାଇତୁଲ୍ଲାହ । ଏହି ଭବନେର ଏକ କୋଣେ କାଳୋ ରଂ-ଏର ଏକଟି ଛୋଟୋ ପାଥର ଆଛେ, ଯାକେ ହାଜାର ଉଲ ଆସନ୍‌ଯାଦ ବଳା ହ୍ୟ । କାବାର ଦିକେ ମୁଖ କରେ ନାମାଜ ପଡ଼ା ହ୍ୟ । ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥାର ଆଗେ ଥେବେଇ ଆରବଦେର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଛିଲ କାବା ଶରୀଫ । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ କାବା ଶରୀଫ ଇସଲାମେର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ହେଁ ଓଠେ ।

୭୧୨ ଖ୍ରୀସ୍ଟାବ୍ଦ ନାଗାଦ ଆରବି ମୁସଲମାନରା ମହମ୍ମଦ ବିନ କାଶେମେର ନେତୃତ୍ବେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶେ ଅଭିଯାନ କରେନ । ଇତୋମଧ୍ୟେ ଆରବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟକ୍ରମୀ ଶତକରୀ ଶତକରୀ ସମ୍ପଦ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶତକେଇ ଭାରତେ ଏସେଛିଲେନ । ଅର୍ଥାତ୍, ଭାରତରେ ସଙ୍ଗେ ଇସଲାମେର ପରିଚୟ ରାଜ୍ୟବିଭାଗେର ଆଗେଇ ଶୁରୁ ହେଁଛିଲ ।

ଆରବ ଶକ୍ତି ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ, ମୁଲତାନ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତରେ କିଛୁ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରେ । ବିନ କାଶେମେର ମୃତ୍ୟୁର ପର ତାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଥେବେ ସରେ ଯେତେ ଥାକେ । ଆରବରା ନବମ ଶତବୀର ଶେଷେର ଦିକେ ଭାରତେ ଅଭିଯାନ ବନ୍ଧ କରେ ଦେଯ ।

ଆରବଦେର ପର, ଆରେକ ମୁସଲମାନ ଶକ୍ତି ତୁରିକିରା ଭାରତେର ସମ୍ପଦେର ଟାନେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରତେ ଉଦ୍ଦୟୋଗୀ ହ୍ୟ । ଖ୍ରୀସ୍ଟାଯ ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତବୀରେ ଗଜନିର ସୁଲତାନ ମାହମୁଦ ଏବଂ ଘୁରେର ଶାସକ ମୁଇଜୁଡ଼ିନ ମହମ୍ମଦ ବିନ ସାମ (ମହମ୍ମଦ ଘୁରି) — ଏହି ଦୁଇ ତୁରିକିଶାସକ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶେ ବିଜ୍ୟ ଅଭିଯାନେ ଆସେନ । ଅବଶ୍ୟ ଉଭୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ ଛିଲ ନା । ଗଜନିର ମାହମୁଦେର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଛିଲ ମନ୍ଦିରଗୁଣି ଥେବେ ଧନସମ୍ପଦ ଲୁଟ୍ଟନ କରେ ଖୋରାକାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏଶିଆଯ ତାର ସାମାଜିକ ତାତ୍ତ୍ଵବିଷୟରେ ଆନୁମାନିକ ୧୦୦୦ ଖ୍ରୀସ୍ଟାବ୍ଦ ଥେବେ ୧୦୨୭ ଖ୍ରୀସ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାହମୁଦ ପ୍ରାୟ ସତେରୋବାର ଉତ୍ତର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରେନ ।

ତୁରକରୋ କଥା

ଗଜନିର ଭୁଲଭାନ ମାହମୁଦ

ସୁଲତାନ ମାହମୁଦ ଭାରତେର ଇତିହାସେ ଏକଜନ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ହିସାବେ ଚିହ୍ନିତ ହେଁ ଆଛେ । କିନ୍ତୁ ତିନି ଶୁଦ୍ଧି ଏକଜନ ଯୋଦ୍ଧା ଛିଲେନ ନା । ଭାରତ ଥେବେ ତିନି ଯେମନ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପଦ ଲୁଟ୍ଟନ କରେଛେ, ତେମନି ନିଜେର ରାଜ୍ୟ ଭାଲୋ କାଜେ ତା ବ୍ୟାପ କରେଛେ । ତାର ଆମଳେ ରାଜଧାନୀ ଗଜନି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶହରକେ

সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। মাহমুদ সেখানে প্রাসাদ, মসজিদ, গ্রন্থাগার, বাগিচা, জলাধার, খাল এবং আমু দরিয়ার (নদী) উপর বাঁধ নির্মাণ করেন। তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেন যেখানে শিক্ষকদের বেতন ও ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। মাহমুদের আমলে দুজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন অল বিরুনি এবং ফিরদৌসি। অল বিরুনি ছিলেন দর্শন এবং গণিতে পদ্ধিত। ভারতে তিনি পর্যটক হিসাবে আসেন। তাঁর লেখা কিতাব অল-হিন্দ সে সময়ের ভারতের ইতিহাস জানার জন্য জুরি গ্রন্থ। কবি ফিরদৌসি, শাহনামা কাব্য লিখেছিলেন।

অন্যদিকে মহম্মদ ঘুরি ভারতবর্ষের শাসক হতে চেয়েছিলেন। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে তিনি রাজপুত রাজা তৃতীয় পৃষ্ঠীরাজ চৌহানকে হারিয়ে দেন। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘুরি মারা যান। ঘুরির অন্যতম সঙ্গী কুতুবউদ্দিন আইবক সেই সময়ে দিল্লিতে সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলায় তুর্কি অভিযান

আনুমানিক ১২০৪ খ্রিস্টাব্দের শেষ বা ১২০৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজি বাংলার নদিয়া দখল করেছিলেন। সেই থেকে বাংলায় তুর্কি শাসন শুরু হয়েছিল।

টুকরো কথা

মাত্র আঠাবোজন ঘোড়জওয়ার মিলে বাংলা জয়! তা-ও কি হয়?

তুর্কি আক্রমণের প্রায় চালিশ বছর পরে ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই সিরাজ বাংলায় এসে বখতিয়ার খলজির অভিযানের কাহিনি শুনেছিলেন। তাঁর লেখা তবকাত-ই নাসিরি থেকে জানা যায় যে বখতিয়ার খলজি এবং তাঁর তুর্কি বাহিনী ঘোড়া ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে নদিয়ায় ঢুকেছিলেন। সে সময় বাংলা থেকে উত্তর দিকে তিব্বত পর্যন্ত ঘোড়ার ব্যবসা বেশ চালু ছিল। কাজেই তুর্কিদের নদিয়ায় ঢুকতে দেখে কেউই তাদের আক্রমণকারী ভাবেনি। এই নদিয়া কোথায় ছিল?

হয়তো এই নদিয়া ছিল বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথী নদীর তীরে, যা আজ নদীর তলায় চলে গেছে। অথবা হয়তো বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার নৌদা গ্রামই হলো সেকালের নদিয়া। সে যাই হোক, তুর্কি অভিযানের সময় রাজা লক্ষ্মণ সেন নদিয়ায় ছিলেন।

গল্প আছে যে, বখতিয়ারের সঙ্গে মাত্র সতেরো জন সৈন্য ছিল। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। সেকালে উত্তর ভারত থেকে বাংলায় আসার একাধিক রাস্তা

টুকরো কথা

পঁরতী খিলাফৎ

প্রথম চারজন খলিফার পরে খলিফা পদটি কয়েকটি রাজবংশের হাতে চলে যায়।

যেমন - উম্মাইয়া, আববাসিয়া, ফতিমিদ, অটোমান প্রভৃতি। উম্মাইয়া খিলাফৎ (৬৬১ - ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ) গড়ে উঠেছিল সিরিয়ার দমাস্কাসকে কেন্দ্র করে। আববাসিয়া খিলাফৎ (৭৫০ - ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ)

- এর রাজধানী ছিল বোগদাদ। খলিফা আল হারুন - আল রসিদ আববাসিদের মধ্যে বিখ্যাত খলিফা। আববাসিয়াদের ক্ষমতা শেষ করেক শতকে কমে যায়। তখন মিশরে ফতিমিদ খিলাফৎ (৯০৯ - ১১৭১ খ্রিস্টাব্দ)

- এর শাসক ছিল। এবং এই সময় উম্মাইয়ারাও আবার স্পেনে খিলাফৎ প্রতিষ্ঠা করে (৯২৯ - ১০৩১ খ্রিস্টাব্দ)। অটোমানরাও তাদের খিলাফৎ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (১৫১৭ - ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ)। এই ভাবে খলিফা ও খিলাফতের ধারা চলেছিল।

ঠিকাণ ও প্রতিষ্ঠা

ছিল। সাধারণত বিহার থেকে বাংলায় আসার সময়ে রাজমহল পাহাড়ের উত্তর দিকের পথ ধরেই আসা হতো। রাজা লক্ষ্মণসেনও ওই পথে তুর্কি আক্রমণ ঠেকানোর জন্য সৈন্য মোতায়েন করেছিলেন। কিন্তু বখতিয়ার খলজি তাঁর সৈন্যদের অনেকগুলি ছোটো ছোটো দলে ভাগ করে ঝাড়খণ্ডের দুর্গম জঙগলের মধ্য দিয়ে বাংলায় এসেছিলেন।

তখন দুপুরবেলা, বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন খেতে বসেছিলেন। তুর্কিরা আসছে শুনে তিনি কোনো প্রতিরোধ না করে পূর্ববঙ্গের দিকে চলে যান।

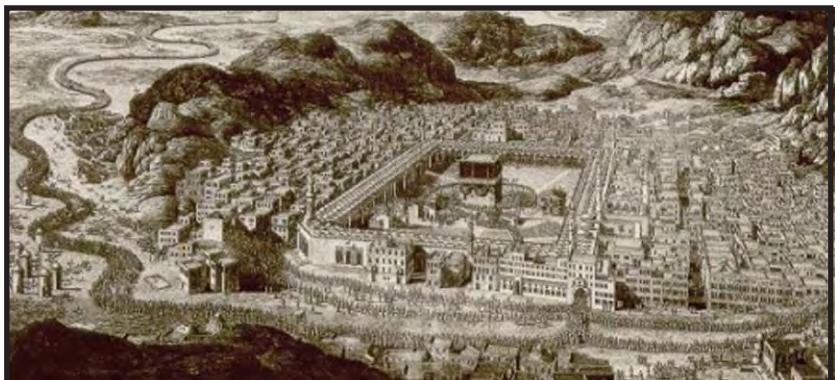
তুর্কিরা বিনা যুদ্ধেই নদিয়া জয় করে। এরপর বখতিয়ার নদিয়া ছেড়ে লক্ষ্মণাবতী অধিকার করে নিজের রাজধানী স্থাপন করেন। এই শহরকে সমকালীন ঐতিহাসিকরা লখনোতি বলে উল্লেখ করেছেন।

বখতিয়ার খলজি নিজের নতুন রাজ্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের জন্য একজন করে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এইসব শাসনকর্তারা ছিলেন তাঁর সেনাপতি। বখতিয়ার খলজি লখনোতিতে মসজিদ, মাদ্রাসা এবং সুফি সাধকদের আস্তানা তৈরি করে দেন।

লখনোতি রাজ্যের সীমানা উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট থেকে রংপুর শহর, দক্ষিণে পদ্মা নদী, পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী এবং পশ্চিমে বখতিয়ার খলজি অধিকৃত বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এরপর বখতিয়ার খলজি তিব্বত আক্রমণ করে রাজ্যবিস্তার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয়নি।

১২০৬ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজি মারা যান। বাংলায় তুর্কি অভিযানের একটা অধ্যায় শেষ হয়। এই একই সময়ে পূর্ববঙ্গে রাজা লক্ষ্মণসেনেরও মৃত্যু ঘটেছিল।

ছবি ১.৩ : মুক্তা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আঁকা একটি ছবি



ভেবে দেখো



ঝুঁঁজে দেখো



১। শূন্যস্থান পূরণ করো :

- (ক) বঙ্গ নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় _____ (ঐতিহ্যে আরণ্যক/আইন-ই-আকবরি/অর্থশাস্ত্র) গ্রন্থে।
- (খ) প্রাচীন বাংলার সীমানা তৈরি হয়েছিল _____, _____ এবং _____ (ভাগীরথী, পদ্মা, মেঘনা/গঙ্গা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, সিঞ্চু/কৃষ্ণা, কাৰেৱী, গোদাবৰী) নদী দিয়ে।
- (গ) সকলোভূতপথনাথ উপাধি ছিল _____ (শশাঙ্কের/হৰ্ষবৰ্ধনের/ধৰ্মপালের)।
- (ঘ) কৈবৰ্ত্ত বিদ্রোহের একজন নেতা ছিলেন _____ (ভীম/রামপাল/প্রথম মহীপাল)।
- (ঙ) সেন রাজা _____ (বিজয়সেনের/বঞ্চালসেনের/লক্ষ্মণসেনের) আমলে বাংলায় তুর্কি আক্ৰমণ ঘটে।
- (চ) সুলতানি যুগের একজন ঐতিহাসিক ছিলেন _____ (মহম্মদ ঘূৰি/মিনহাজ-ই সিরাজ/ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজি)।

২। ‘ক’ স্তৰের সঙ্গে ‘খ’ স্তৰ মিলিয়ে লেখো :

ক-স্তৰ	খ-স্তৰ
বজ্রভূমি	বৌদ্ধ বিহার
লো-টো-মো-চিহ্ন	আধুনিক চট্টগ্রাম
গঙ্গাইকোঠাচোল	বাক্পত্রিভাজ
গোড়বহো	উত্তর রাঢ়
হরিকেল	অল বিৰুনি
কিতাব অল-হিন্দ	প্রথম রাজেন্দ্র

৩। সংক্ষেপে (৩০-৫০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর লেখো :

- (ক) এখনকার পশ্চিমবঙ্গের একটি মানচিত্র দেখো। তাতে আদি-মধ্য যুগের বাংলার কোন কোন নদী দেখতে পাবে?
- (খ) শশাঙ্কের আমলে বাংলার আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল তা ভেবে লেখো।
- (গ) মাংস্যন্যায় কী?
- (ঘ) খ্রিস্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতকের আঞ্চলিক রাজ্যগুলি কেমন ভাবে গড়ে উঠেছিল?
- (ঙ) সেন রাজাদের আদি নিবাস কোথায় ছিল? কীভাবে তারা বাংলায় শাসন কায়েম করেছিলেন?
- (চ) সুলতান মাহমুদ ভারত থেকে লুঠ করা ধনসম্পদ কীভাবে ব্যবহার করেছিলেন?

৪। বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর লেখো :

- (ক) প্রাচীন বাংলার রাঢ়-সুয়াঁ এবং গৌড় অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিচয় দাও।
- (খ) শশাঙ্কের সঙ্গে বৌদ্ধদের সম্পর্ক কেমন ছিল, সে বিষয়ে তোমার মতামত দাও।
- (গ) ত্রিশক্তি সংগ্রাম কাদের মধ্যে হয়েছিল? এই সংগ্রামের মূল কারণ কী ছিল?
- (ঘ) ছক ২.১ ভালো করে দেখো। এর থেকে পাল ও সেন শাসনের সংক্ষিপ্ত তুলনা করো।
- (ঙ) দক্ষিণ ভারতে চোল শক্তির উত্থানের পটভূমি বিশ্লেষণ করো। কোন কোন অঞ্চল চোল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল?
- (চ) ইসলাম ধর্মের প্রচারের আগে আরব দেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ইসলাম ধর্মের প্রচার আরব দেশে কী বদল এনেছিল?

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

- (ক) মনে করো তুমি রাজা শশাঙ্কের আমলের একজন পর্যটক। তুমি তাম্রলিপ্ত থেকে কর্ণসুবর্ণ যাচ্ছ। পথে তুমি কোন কোন অঞ্চল ও নদী দেখতে পাবে? কর্ণসুবর্ণে গিয়েই বা তুমি কী দেখবে?
- (খ) মনে করো দেশে মাঃস্যন্যায় চলছে। তুমি ও তোমার শ্রেণির বন্ধুরা দেশের রাজা নির্বাচন করতে চাও। তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা করো।
- (গ) মনে করো যে তুমি কৈবর্ত নেতা দিব্য। পাল রাজাদের বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগুলি কী কী থাকবে? কীভাবেই বা তুমি তোমার বিদ্রোহী সৈন্যদল গঠন ও পরিচালনা করবে তা লেখো।
- (ঘ) মনে করো তুমি বাংলায় তুর্কি আক্রমণের দিন দুপুরবেলায় নদিয়া শহরের রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলে। সেই সময় কী দেখলে?

৫. বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে পড়ার মাঝে মজার কাজ ও ভেবে বলো শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর কল্পনা করে লেখো শীর্ষক কৃত্যালি গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।



টৃতীয় অধ্যায়

ভারতের সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষয়ক্ষতি ধারা

খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক



৩.১ ভারতের অর্থনীতি : খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক

এই অধ্যায়ে আমরা পড়ব খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকে ভারতের অর্থনীতির কথা। বিশেষ করে ঐ সময়ে দক্ষিণ ভারত এবং পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাংলার অবস্থা কেমন ছিল তা আমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকেই উত্তর ভারতের বেশ কিছু জায়গায় ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দ দেখা গিয়েছিল। নগরগুলির খারাপ অবস্থা পর্যটকদের চোখে পড়েছিল। পুরোনো বাণিজ্য-পথগুলির গুরুত্ব কমে গিয়েছিল। তবে নতুন বাণিজ্য পথ বা নতুন শহর গড়ে উঠেনি তাও নয়। সুয়ান জাঁ থানেশ্বর, কনৌজ ও বারাণসীতে ব্যবসায়িক কাজকর্মের রমরমার উল্লেখ করেছেন। আবার প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবেও স্থানীক্ষণ এবং কনৌজ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বন্দর নগরীগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। বরং নবম শতাব্দী থেকে আরব বণিকদের যাতায়াত বেড়ে যাওয়ায় ও বহির্বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছিল। প্রামাণ বাজারে খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য শস্য বেচাকেনা অনেকগুণ বেড়েছিল। বিশেষত আখ, তুলো এবং নীলের হাট অনেক অঞ্চলেই শুরু হয়েছিল। এসময়ে উত্তর ভারতে ভালো মানের সোনা বা বুপোর মুদ্রার অভাব ছিল। তবে সমকালীন গ্রন্থগুলিতে বহু ধরনের মুদ্রার নাম পাওয়া গেছে। যদিও সেগুলি কঠটা চলত, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না।

৩.১.১. ভারতের সামন্ত ব্যবস্থা

আঞ্চলিক রাজশাস্ত্রগুলির বাড়-বাড়ন্তের ছাপ সে সময়ের ভারতীয় সমাজ এবং অর্থনীতিতে পড়েছিল। সমাজে এক বিশেষ গোষ্ঠীর ক্ষমতা বেড়ে যায়। সমকালীন লেখকরা সামন্ত, রাজ, বৌগক—এসব নামে ঐ গোষ্ঠীর পরিচয় দিয়েছেন। এদের মধ্যে কিছু ছিল উঁচু রাজকর্মচারী। তাদের নগদ বেতন না দিয়ে অনেক সময়ে জমি দেওয়া হতো। সেই জমির রাজস্বই ছিল ঐ কর্মচারীদের আয়।

আবার কিছু অঞ্চলে যুদ্ধে হেরে যাওয়া রাজারাও সেই অঞ্চলের রাজস্ব ভোগ করত। কখনওবা যুদ্ধপটু উপজাতি নেতারা কোনো কোনো অঞ্চলে কর্তৃত্ব করত।

এই গোষ্ঠীগুলির এক জায়গায় মিল ছিল। এরা কেউই পরিশ্রম করে উৎপাদন করত না। অন্যের শ্রমে উৎপান্ন দ্রব্য বা রাজস্ব থেকে নিজেরা জীবিকা চালাত। এই অন্যের শ্রমভোগী গোষ্ঠীর মধ্যেও স্তরভাগ ছিল। কেউ ছিল একটি প্রামের



ପ୍ରଥମ । କେଉଁ ବା କରେକଟି ପ୍ରାମ ମିଲିଯେ ଏକଟା ଅଞ୍ଚଳେର ଦଖଲ ରାଖନ୍ତ । ଏକଟି ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳେର ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃ ଛିଲ କାରୋ କାରୋ । ଏଭାବେଇ ରାଜା, ଗୋଟୀର ଶାସକ ଏବଂ ଜନଗଣକେ ନିଯେ ଏକଟି ସ୍ତରଭେଦ ତୈରି ହେଁଛିଲ ସମାଜେ । ମହାସାମନ୍ତ, ସାମନ୍ତଦେର ମଧ୍ୟେ ସବସମରେଟି ଯୁଦ୍ଧ-ବାଗଡ଼ା ଚଲନ୍ତ । ସବାଇ ଚାହିତ ନିଜେର କ୍ଷମତା ଆରା ଖାନିକ ବାଡ଼ିଯେ ନିତେ । କଥନୋବା ଏରା ଜୋଟ ବେଁଧେ ରାଜାର ବିରୁଦ୍ଧେ ଯୁଦ୍ଧେ ନାମତ । ଏକସମୟେ ଦଖଲ କରା ପ୍ରାମ ଥେକେ ରାଜସ୍ଵ ଆଦାୟେର ପାଶାପାଶି, ପ୍ରାମେର ଶାସନ ଏବଂ ବିଚାରନ୍ତ କରନ୍ତ ଏହି ଗୋଟୀ । ରାଜାର କ୍ଷମତାକେଓ ଏରା ଅନେକ ସମୟେ ଅସ୍ଥିକାର କରନ୍ତ । ଏର ଫଳେ ରାଜଶକ୍ତିର ଦୁର୍ବଲତା ପରିଷକାର ହେଁ ଯାଇ । ସାମନ୍ତ ନେତାଦେର ଦାପଟେ ପ୍ରାମଗୁଲିର ସ୍ଵାୟତ୍ତଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଓ ନଷ୍ଟ ହେଁ (ସ୍ଵାୟତ୍ତଶାସନ ନିଯେ ଆରା ଜାନବେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟେ) ।

ସେଇ ସମାଜେର ଛବି ଆଁକଳେ

ସେଟି ହବେ ଏରକମ :



ଦେଖୋ, ତ୍ରିଭୁଜଟି ନିଚେର ଦିକେ ଚାହୁଁବାର ହେଁଛେ । ତାର ମାନେ, ନିଚେ ଅନେକ ଜନଗଣ, ତାଦେର ଉପର ବେଶ କିଛୁ ସାମନ୍ତ ବା ମାବାରି ଶାସକ । ମାବାରି ଶାସକଦେର ଉପରେ ଅନ୍ନ କିଛୁ ମହାସାମନ୍ତ । ଆର ସବାର ଉପରେ ରାଜା । ରାଜସ୍ଵ ଓ ଶାସନେର ଅଧିକାର ଏହିଭାବେ ସ୍ତରେ ସ୍ତରେ ଭାଗ ହେଁ ଯାଓଯାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକେ ‘ସାମନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା’ ବଲେ ।

ଟୁକରୋ କଥା

ଇଉରୋପେ ଜ୍ଞାନପଦ୍ମ

ଖ୍ରିସ୍ତୀଯ ନବମ ଶତକେ ପଞ୍ଚମ ଇଉରୋପେ ଏକ ରକମ ସାମରିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖା ଗିଯାଇଛି । ଏକେ ସାମନ୍ତତତ୍ତ୍ଵ ବଲେ । ସାମନ୍ତ ସମାଜେର କାଠାମୋ ଛିଲ ତ୍ରିଭୁଜେର ମତୋ । ତାର ନାନା ସ୍ତରେ ଛିଲେନ ରାଜା, ବିଭିନ୍ନ ସାମନ୍ତ ଏବଂ ଉପସାମନ୍ତ । ସାମନ୍ତପ୍ରଭୁଦେର ଅଧୀନ ନାଇଟରା ଲୋହାର ପୋଶାକ ପରେ, ଘୋଡ଼ାଯ ଚଢେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମନ୍ତପ୍ରଭୁ ବହୁ ଦୁର୍ଗ ତୈରି କରେନ । ସାମନ୍ତପ୍ରଭୁଦେର ମ୍ୟାନର ବା ଖାମାରେ ଭୂମିଦାସ ବା ସାର୍ଫଦେର ଖାଟିଯେ ଉଂପାଦନ କରା ହତୋ । ଏ ଛାଡ଼ା ଛିଲେନ ସ୍ଵାଧୀନ ଚାଷୀ । ଚାଷବାସ ଛାଡ଼ା ବାଣିଜ୍ୟ ହତୋ । ଗଡ଼େ ଉଠେଛିଲ ନଗର । ଖ୍ରିସ୍ତୀଯ ଦାଦଶ ଶତକ ଛିଲ ଇଉରୋପେ ସାମନ୍ତତତ୍ତ୍ଵର ସେରା ସମୟ । ଏର ଦେଡଶୋ-ଦୁଶ୍ଶୋ ବହର ପର ଥେକେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଯ ଭାଙ୍ଗନ ଧରନ୍ତ ଥାକେ । ତବେ, ଘୋଡ଼ଶ ଶତକେର ଇଉରୋପେର ପୂର୍ବ ଭାଗେ ଆବାର ଭୂମିଦାସ ପ୍ରଥା କିଛୁ କାଲେର ଜନ୍ୟ ଫିରେ ଏସେଛିଲ ।

৩.১.২ দক্ষিণ ভারতের অর্থনীতি

দক্ষিণ ভারতের রাজশাস্ত্রগুলি বহু মন্দির তৈরি করেছিল। সেগুলি শুধুমাত্র পুজোর জন্যই ব্যবহৃত হতো না। তাঙ্গোর এবং গঙ্গাইকোঞ্চেলপুরমে চোল শাসক রাজরাজ এবং রাজেন্দ্র সময়ে দুটি অসাধারণ সুন্দর মন্দির তৈরি হয়। মন্দির ঘিরে লোকালয় এবং শিল্পীদের বসবাস গড়ে উঠত। মন্দির কর্তৃপক্ষকে রাজা, ব্যবসায়ী ও অভিজাতরা নিশ্চর জমি দান করতেন। সেই জমির ফসল মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত মানুষজনের জীবনযাপনের জন্য লেগে যেত। পুরোহিত, মালাকার, রাঁধনি, গায়ক, নর্তক-নর্তকী প্রমুখ মন্দির চতুরে থাকত। চোল রাজ্যের ব্রোঞ্জ হস্তশিল্প খুব বিখ্যাত ছিল। তামিলনাড়ু অঞ্চলে কাবেরী এবং তার শাখানদীগুলি থেকে খাল কেটে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করা হয়। ফলে কৃষি উৎপাদন বাঢ়ে, কোথাও বছরে দু-বার ফসল ফলানোও সম্ভব হয়। যেখানে সেচের সুযোগ কম ছিল, সেখানে বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য পুকুর, বিল কাটা হতো। কোথাও কুয়োর ব্যবস্থাও ছিল।

চোল রাজ্যের প্রধান ছিলেন রাজা। তাঁকে মন্ত্রীদের এক পরিষদ সহায়তা করত। রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশ বা মণ্ডলমে ভাগ করা হয়েছিল। কৃষকদের বসতিকে ঘিরে গড়ে ওঠা প্রামকে শাসন করত প্রাম-পরিষদ বা উর। এই রকম কয়েকটি প্রামকে নিয়ে গঠিত হতো নাড়ু। উর এবং নাড়ু— এই দুই স্থানীয় সভা স্বায়ত্ত্বাসন, বিচার এবং রাজস্ব বা কর সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করত। ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মদেয় জমি দেওয়ার ফলে কাবেরী উপত্যকায় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে বহু নতুন নতুন প্রামের পত্তন হয়েছিল। এই নতুন প্রামগুলিকে তদারকি করার জন্য বয়স্ক মানুষদের নিয়ে তৈরি হতো সভা। তারা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করত। ব্যবসায়ীদের স্বার্থ এবং বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলার জন্য ‘নগরম’ নামের আরেকটি পরিষদ তৈরি হয়েছিল।

দক্ষিণ ভারতে অবশ্য নবম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে বাণিজ্যের উন্নতি লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন লেখ থেকে জানা যায় যে চেতি বা বণিকরা পণ্য সাজিয়ে যাতায়াত করতেন। বিভিন্ন বণিক সংগঠন বা সমবায়ের কথা ও জানা যায়। ঐ সংগঠনগুলি বিভিন্ন মন্দিরকে জমি দান করতেন, সেরকম বর্ণনা দক্ষিণ ভারতে তাপ্তলেখগুলিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে চোলদের ক্ষমতা বাড়ায় সেখানকার বাণিজ্যের উপর ভারতীয় বণিকদের প্রভাব আস্তে আস্তে বেড়েছিল।

এই সময় রাজারা অনেকেই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন উপাধিতে নিজেদেরকে ভূষিত করতেন। যেমন মহারাজা-অধিরাজ, ত্রিভুবন-চক্ৰবৰ্তীন এই রকম সব। তবে এঁদের মধ্যে অনেকেই স্থানীয় সামন্ত বা ধনী কৃষক, ব্যবসায়ী এবং



কর সংগ্রহ করা কাকে
বলে? এখন কী কী ভাবে
কর সংগ্রহ করা হয়?



ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিতেন। কৃষক, পশুপালক এবং কারিগরদের উৎপাদন থেকে রাজা ভাগ নিতেন। ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও কর সংগ্রহ করা হতো। সেখান থেকেই রাজার বিলাসবহুল জীবন চলত। সৈন্যবাহিনীর দেখাশোনা, দুর্গ এবং মন্দির বানানোয় সেই অর্থ খরচ করা হতো। তাছাড়া, যুদ্ধের সময় বিজয়ী শক্তির সৈন্যরাও পরাজিত অঞ্চলে যথেষ্ট লুঠপাট চালাত। স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবারগুলোর হাতেই খাজনা সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হতো। খাজনার একাংশ ঐ পরিবারগুলি নিজেদের জন্য রেখে, বাকি অংশ রাজকোষাগারে জমা দিত। কোনো কোনো সময় পরাজিত রাজাদের ক্ষমতা এবং গুরুত্ব বুঝে তাদের অধীনতা স্বীকার করিয়ে নিয়ে জমি-জায়গা দান হিসাবে ফেরত দেওয়া হতো। কৃষিজমির পরিমাণ বাড়ানোর জন্য ব্রাহ্মণদের অনেক সময় জমি দান করা হতো। তারা অনাবাদী জমি এবং জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি তৈরি করতেন। ব্রাহ্মণদের কিছু জমি দেওয়া হতো, যার কর নেওয়া হতো না। এই জমি দানের ব্যবস্থাকে ব্রহ্মদেয় ব্যবস্থা বলা হতো।

৩.১.৩ পাল-সেন যুগের বাংলার ধনসম্পদ ও অর্থনীতি

পাল-সেন যুগে কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যই ছিল বাংলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি। তবে এই যুগে বাংলার অর্থনীতিতে বাণিজ্যের গুরুত্ব ক্রমশই কমে এসেছিল। ভারতের পশ্চিম দিকের সাগরে আরব বণিকদের দাপটের ফলে বাংলার বণিকরা পিছু হটেছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলার বণিকদের গুরুত্ব কমে যাওয়ায় বাংলার অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হয়ে পড়েছিল। বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে মুদ্রা ব্যবস্থার যোগ ছিল। পাল-সেন যুগের বাংলায় সোনা-রূপোর মুদ্রার ব্যবহার খুব কমে যায়। কড়িই হয়ে উঠেছিল জিনিস কেনা-বেচার প্রধান মাধ্যম।

এই সময়ের কৃষিনির্ভর সমাজে ভূমিদানের অনেক নির্দশন আছে। পাল যুগে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে রাজারা ভূমিদান করতেন। সেন যুগে অনেক ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করা হয়েছে। সে আমলের লেখগুলি থেকে জানা যায় যে জমি কেনা-বেচার সময় কৃষককেও তার খবর দিতে হতো। সুতরাং, সমাজে কৃষককে নিতান্ত অবহেলা করা হতো না। তবে জমিতে মূল অধিকার ছিল রাষ্ট্র বা রাজার।

রাজারা উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ ($1/6$ ভাগ) কৃষকদের কাছ থেকে কর নিতেন। তাঁরা নিজেদের ভোগের জন্য ফুল, ফল, কাঠও প্রজাদের কাছ থেকে কর হিসাবে আদায় করতেন। বণিকরাও তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য রাজাকে কর দিত। এই তিন প্রকার কর ছাড়াও নানা রকমের অতিরিক্ত কর



রাজারা কেন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে জমি দান করতেন বলে মনে হয়?



ছিল। নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রজারা রাজাকে কর দিত। সমগ্র গ্রামের উপরেও কর দিতে হতো গ্রামবাসীদের। এছাড়া হাট এবং খেয়াঘাটের উপরে কর চাপানো হতো।

এই যুগের প্রধান ফসলগুলি ছিল ধান, সরবে এবং নানারকমের ফল যেমন আম, কাঠাল, কলা, ডালিম, খেজুর, নারকেল ইত্যাদি। আজকে বাঙালির খাদ্যতালিকায় ডাল একটি প্রধান উপাদান। অথচ, সে যুগের শস্যের মধ্যে ডালের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এ ছাড়া কার্পাস বা তুলো, পান, সুপুরি, এলাচ, মহুয়া ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। গ্রামের আশে-পাশে ঘন বাঁশবন এবং নানারকম গাছের কথা জানা যায়। সেগুলির কাঠ ছিল এ যুগের অন্যতম প্রধান সম্পদ। নদনদীপূর্ণ বাংলার আরেকটি বড়ো সম্পদ ছিল মাছ।

টুকরো কথা

পাঞ্জালিপি খাওয়া-দাওয়া

যে-দেশে ধানই হলো প্রধান ফসল সে-দেশে ভাতই যে মানুষের প্রধান খাদ্য হবে তাতে সন্দেহ নেই। গরম ভাতে গাওয়া ঘি, তার সঙ্গে মৌরলা মাছ, নালতে (পাট) শাক, সর-পড়া দুধ আর পাকা কলা দিয়ে খাবারের বর্ণনা আছে প্রাচীন কাব্যে। গরিব লোকের খাদ্যতালিকায় থাকত নানা ধরনের শাক-সবজি। আজ আমরা যে-সব সবজি খাই যেমন বেগুন, লাটু, কুমড়ো, বিশে, কাঁকরোল, ডুমুর, কচু ইত্যাদি প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালির খাবারে জায়গা করে নিয়েছে। নদীনালার দেশে বুই, পুঁটি-মৌরলা, শোল, ইলিশ ইত্যাদি মাছ খাওয়ার অভ্যেসও ছিল। সেকালে বাঙালি সমাজের সব লোকে না খেলেও অনেকেই হরিণ, ছাগল, নানা রকমের পাখি ও কচ্ছপের মাংস, কাঁকড়া, শামুক, শুকনো মাছ ইত্যাদি খেত। অনেক পরে মধ্যযুগে পোতুর্গিজদের কাছ থেকে বাঙালির লোকেরা আলু খেতে শিখেছে। ডাল খাওয়ার অভ্যেস হয়তো বাঙালি পেয়েছে উত্তর ভারতের মানুষদের কাছ থেকে। তা ছাড়া আখের গুড়, দুধ এবং তার থেকে তৈরি দই, পায়েস, ক্ষীর প্রভৃতি ছিল বাঙালির প্রতিদিনের খাদ্যবস্তু। আর ছিল বাংলায় উৎপন্ন লবণ। মহুয়া এবং আখ থেকে তৈরি পানীয়ও বাঙালি সমাজে চালু ছিল।

গৃহপালিত এবং বন্য প্রাণীর মধ্যে ছিল গোরু, বলদ, ছাগল, হাঁস, মুরগি, পায়রা, কাক, কোকিল, নানান জলচর পাখি, ঘোড়া, উট, হাতি, বাঘ, বুনো মোষ, বানর, হরিণ, শুকর, সাপ ইত্যাদি। এর মধ্যে ঘোড়া এবং উট বাংলার বাইরে থেকে এসেছিল।



সে যুগের বাংলার প্রধান ফসলগুলির ওপর-পাখির মধ্যে কোনগুলি আজকের পশ্চিমবঙ্গেও দেখা যায়?



টুকরো কথা

চক্রপাণিদত্ত

চক্রপাণিদত্ত ছিলেন পালযুগের একজন নামকরা চিকিৎসা-বিজ্ঞানী। তাঁর বাড়ি ছিল সম্ভবত বীরভূম জেলায়। প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী চরক ও সুশ্রুতের রচনার ওপর তিনি টীকা লিখেছিলেন। এ ছাড়া, ভেষজ গাছ-গাছড়া, ঔষধের উপাদান, পথ্য নিয়েও তিনি বই লিখেছিলেন। তাঁর লেখা সেরা বই হলো চিকিৎসা-সংগ্রহ।

শিঙ্গদ্রব্যের মধ্যে কার্পাস বস্ত্র ছিল প্রধান সামগ্রী। বাংলার সুম্ভু সুতির কাপড়ের খ্যাতি দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। হস্তশিল্পের মধ্যে কাঠ এবং ধাতুর তৈরি দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস, গয়নার কথা জানা যায়। ঘর-বাড়ি, মন্দির, পালকি, গোরুর গাড়ি, নৌকা ইত্যাদি তৈরিতে কাঠের ব্যাপক ব্যবহার ছিল। তার থেকে বোরা যায় যে সে যুগে কাঠশিল্পীরা সমাজে বিশেষ গুরুত্ব পেতেন। শিল্পীরা বিভিন্ন নিগম বা গোষ্ঠীতে সংজ্ঞবদ্ধ ছিলেন।

৩.২ বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি : খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক

পালযুগ বাংলা ভাষার উৎপত্তির সময়কাল। আনুমানিক ৮০০-১১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাগধী অপভ্রংশ ভাষার গৌড়-বঙ্গীয় রূপ থেকে ধীরে ধীরে প্রাচীন বাংলা ভাষার জন্ম হয়। সেটাই ছিল সাধারণ, নিরক্ষর লোকের ভাষা।

সাহিত্য, ব্যাকরণ, ধর্ম, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র তখনও প্রধানত সংস্কৃত ভাষাতেই লেখা হত। এ ভাষা শিক্ষিত, পঞ্জিত এবং সমাজের উঁচু তলার মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যেমন, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্য বা চক্রপাণিদত্তের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বইগুলো সংস্কৃত ভাষাতে লেখা।

টুকরো কথা

রামচরিত

কবি সন্ধ্যাকর নন্দী পালরাজ রামপালের ছেলে মদনপালের শাসনকালে (আনুমানিক ১১৪৩-’৬১খ্রিঃ) রামচরিত কাব্য লিখেছিলেন।

রামচরিতের কাহিনি রামায়ণের গল্প অনুসারে লেখা হয়েছে। এতে কবি একই কথার দু-রকম মানে করেছেন। তিনি একদিকে রামায়ণের রাম এবং অন্যদিকে পালরাজ রামপালের কথা লিখেছেন।

রামায়ণের আদলে লেখা হলেও এই কাব্য শুধুই বাজ্জীকি-রামায়ণের পুনরাবৃত্তি নয়। এই কাব্যে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের বাংলার প্রেক্ষাপটে এক ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ প্রচার করা হয়েছে। রামায়ণের ভূগোল আর রামচরিতের ভূগোলিক বিবরণ এক নয়। রামায়ণের অযোধ্যার বদলে এখানে রামপালের রাজধানী রামাবতীর কথা বলা হয়েছে। রামায়ণের সীতা উদ্ধারের কাহিনির সঙ্গে রামপালের বরেন্দ্রভূমি উদ্ধারের তুলনা করা হয়েছে। রামায়ণে সীতার খোঁজে রামের বনে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানোর কথা আছে। এর সঙ্গে তুলনা করে রামচরিতে বলা হয়েছে যে, রামপাল তাঁর রাজ্যে সামন্তদের সমর্থন জোগাড় করার জন্য নানা জায়গায় ঘুরছেন। এ সামন্তদের সাহায্যেই রামপাল কৈবর্তদের হাত থেকে তাঁর পিতৃভূমি উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলেন। অর্থাৎ, সন্ধ্যাকর নন্দী রামায়ণের সীতা এবং পাল শাসকের আমলের বরেন্দ্রভূমিকে এক করে দিয়েছেন। সীতার

বৃপ্বর্গনার মাধ্যমে বরেন্দ্রভূমি এবং চারপাশের এলাকার নদনদী, ফুলফল, গাছপালা, ফসল, বর্ষাকাল ইত্যাদির বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

একই সঙ্গে রাম এবং রামপালের গল্প লিখতে গিয়ে রামচরিতের ভাষা জটিল হয়ে পড়েছে। এর ভাষা ছিল সংস্কৃত। এই কাব্য পন্ডিত ও শিক্ষিত মানুষদের জন্যই লেখা হয়েছিল সাধারণ মানুষের এই কাব্য পড়ার সামর্থ্য ছিল না।

পাল রাজারা ব্রাহ্মণ ছিলেন না, সন্তবত ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ ছিলেন। তাঁরা বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। তবে শশাঙ্কের আমলের বৌদ্ধধর্মের থেকে পালযুগের বৌদ্ধধর্ম অনেকটা আলাদা ছিল। পাল যুগে মহাযান বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে অন্যান্য দার্শনিক চিন্তাধারা মিলে গিয়ে বজ্রায়ণ বা তন্ত্রায়ণ বা তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের জন্ম হয়েছিল। এই মতের নেতাদের বলা হতো সিদ্ধাচার্য। এছাড়া সহজযান ও কালচক্রযান নামে আরো দু-রকমের বৌদ্ধ ধর্মতের এ সময় জন্ম হয়। সহজযানকে সহজিয়াও বলা হয়।

এই ধর্মীয় ভাবনায় না ছিলো দেবদেবীর স্বীকৃতি, না মন্ত্র-পুজো-আচার-অনুষ্ঠানের গুরুত্ব। এই মতে বিশ্বাসীরা গুরু এবং শিয়ের মধ্যে গভীর যোগাযোগে বিশ্বাস করত। তাঁরা মনে করতেন যে, জ্ঞান মানুষের ভিতরেই থাকে এবং কোনো শাস্ত্রের বই পড়ে তা পাওয়া সন্তুষ্ট নয়। পরিষ্কার মন এবং আত্মার উপর খুব জোর দেওয়া হতো। তাঁরা বলতেন যে, আত্মা শুন্ধ হলে তবেই মানুষ নির্বাণ বা চিরমুক্তি লাভ করতে পারে।

ব্রাহ্মণ গোঢ়ামির বাইরে এই মতবাদগুলিতে উদার ধর্মীয় পথের খোঁজ পেয়েছিল সাধারণ মানুষ। তা ছাড়া সিদ্ধাচার্যরা যেমন লুইপাদ, সরহপাদ, কাহপাদ, ভুসুকুপাদ প্রমুখ তাদের মত প্রচার করতেন স্থানীয় ভাষায়। পালযুগের শেষ দিক থেকে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা এই ভাষায় চর্যাপদ লেখা শুরু করেছিলেন। চর্যাপদের মধ্য দিয়ে তখনকার বাংলার পরিবেশ এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ছবি ফুটে ওঠে। এভাবে তাদের হাত ধরেই আদি বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটেছিল।

টুকরো কথা

চর্যাপদ

চর্যাপদ হলো খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকে লেখা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের কবিতা ও গানের সংকলন। চর্যাপদে যে ভাষা রয়েছে তা হলো আদি বাংলা ভাষার নির্দশন। আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে এই চর্যাপদ-এর পুঁথি উদ্ধার করেন।

টুকরো কথা

নির্বাণ

বৌদ্ধ ধর্মতে নির্বাণ (মৃক্তি) লাভ করলে বারবার মানুষকে জন্মাতে হয় না।

কুষাণ সম্রাট কণিষ্ঠের (খ্রিস্টীয় প্রথম শতক) সমসাময়িক লেখক অশংকায় বৌদ্ধধর্মে নির্বাণ বা মৃক্তি বলতে কী বোঝানো হয় তা খুব সুন্দর একটা উপমা দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছিলেন যে, প্রদীপের তেল ফুরিয়ে গেলে যেমন তারশিখা নিভেয়ায়, জীবনে ক্লেশ বা দুঃখের অবসান হলে চিরতরে মৃক্তি বা নির্বাণ মেলে। এই ব্যাখ্যা বৌদ্ধধর্মের ইন্দ্রিয় শাখার।

মহাযানীদের ধারণা ছিলো যে নির্বাণ এমন একটি অবস্থা যেখানে কোনো কিছুই নেই। পরবর্তী কালে অবশ্য এই ধারণাগুলোতে অনেক রকম পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম শক্তিশালী ছিল। তারা নারী ও পুরুষ উভয়ের ভূমিকাকেই গুরুত্ব দিত।

ঠিক্কিৰ ও প্ৰতিষ্ঠা

পাল শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা এবং বিহারে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্ৰে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছিল। পাল যুগের বাংলায় শিক্ষা-দীক্ষায় ব্রাহ্মণদের থেকে বৌদ্ধ প্রভাব অনেক বেশি পড়েছিল। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের লেখা বহু বই আজ হারিয়ে গেছে। তবে তিব্বতি ভাষায় অনুবাদের মধ্য দিয়ে এদের কিছু-কিছু অস্তিত্ব জানা গেছে।



বৌদ্ধ বিহারগুলির মতো
পড়াশোনার কেন্দ্ৰ কি
আজকাল দেখা যায়?

বৌদ্ধ দাশনিকদের জ্ঞানচৰ্চার কেন্দ্ৰ ছিল আজকের বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে ছড়িয়ে থাকা বৌদ্ধবিহারগুলি। নালন্দা, ওদন্তপুরী (নালন্দার কাছে), বিক্রমশীল (ভাগলপুরের কাছে), সোমপুরী (রাজশাহী জেলার পাহাড় পুরে), জগন্দল (উত্তরবঙ্গে), বিক্রমপুরী (ঢাকা জেলা) প্রভৃতি বিহারগুলি ছিল উল্লেখযোগ্য। পালরাজাদের সমৰ্থনে ও বৌদ্ধ আচার্য এবং ছাত্রদের উৎসাহে এই বিহারগুলিসেকালের শিক্ষা-দীক্ষায় বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল। আচার্য ও ছাত্রদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন বাঙালি। আচার্যদের মধ্যে খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে শাস্ত্রক্ষিত, শাস্তিদেব, কস্তুরীপাদ এবং দশম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান (অতীশ), গোরক্ষনাথ ও কাহুপাদ ছিলেন উল্লেখযোগ্য।

টুকুৰো কথা

নালন্দা

সম্ভবত গুপ্ত সম্রাটদের আমলে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে আজকের বিহার রাজ্যে নালন্দা বৌদ্ধবিহার তৈরি হয়েছিল। কালে কালে সমগ্র এশিয়ায় নালন্দার শিক্ষা-দীক্ষার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। হৰ্ষবৰ্ধন এবং পাল রাজাদের আমলে নালন্দা শাসকদের সাহায্য পেয়েছিল। স্থানীয় রাজা এবং জমিৰ মালিকৰা তো বটেই, এমনকী সুদূর সুমাত্ৰা দ্বীপের শাসকও এই মহাবিহারের জন্য সম্পদ দান কৰেছেন। তা থেকে ছাত্রদের বিনাপয়সায় খাবার, জামাকাপড়, শয়াদ্রব্য এবং ওষুধপত্র দেওয়া হতো। সুদূর তিব্বত, চিন, কোরিয়া এবং মোঙ্গলিয়া থেকে ছাত্ররা এখানে আসত পড়াশোনার জন্য। তার মধ্যে চিনদেশের ছাত্রদের শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ তহবিলের বন্দোবস্ত কৰা হয়েছিল। হিউয়েন সাঙ খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে এই বিহারে শিক্ষালাভ কৰেছেন। কঠিন পৱৰীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হয়ে ছাত্রৰা এখানে পড়াৰ সুযোগ পেত। নালন্দার সমৃদ্ধিৰ যুগে দশ হাজার জন আবাসিক ভিক্ষু এখানে থাকত। তার মধ্যে ১,৫০০ জন ছিল শিক্ষক এবং ৮,৫০০ জন ছিল ছাত্র। ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এৰ খ্যাতি বজায় ছিল। ঐ শতকে তুৰ্কি অভিযানকাৰীৱা বিহার অঞ্চল আক্ৰমণ কৰে এই মহাবিহারেৰ ব্যাপক ক্ষতি কৰেছিল।



ছবি ৩.১ : নালন্দা মহাবিশালের ধ্বংসাবশেষ, বিহার



ছবি ৩.২ : বিক্রমশীল মহাবিশালের ধ্বংসাবশেষ, বিহার



ତୁଳନା କଥା

ବିକ୍ରମଶୀଲ



ତୋମାର ଖାତାଯ ଏକଟା ଶଙ୍କୁ
ଆକୃତିର ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୁପେର
ଛବି ଆଂକୋ ।

ପାଲ ସନ୍ନାଟ ଧର୍ମପାଳ ବ୍ରିଦ୍ଧିଯ ଅଷ୍ଟମ ଶତକେ ମଗଧେର ଉତ୍ତର ଭାଗେ ଗଞ୍ଚାର ତୀରେ ଆଧୁନିକ ଭାଗଲପୁର ଶହରେର କାହେ ବିକ୍ରମଶୀଲ ମହାବିହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେଛିଲେନ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଂଚଶୋ ବର୍ଷର ଏଟି ଟିକେ ଛିଲ । ଏହି ମହାବିହାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଜନ୍ୟ ଏକଶୋର ବେଶି ଆଚାର୍ୟ ଛିଲେନ । ସେଥାନେ ପଡ଼ାଶୋନାର ଜନ୍ୟ ଛାତ୍ରରା ଆସତ । ଏଥାନେ ବ୍ୟାକରଣ, ତକଣାସ୍ତ୍ର, ଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦି ବିସ୍ୟ ପଡ଼ାନୋ ହତୋ । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତିନ ହାଜାର ଛାତ୍ର ଏଥାନେ ପଡ଼ତ ଏବଂ ବିନା ଖରଚେ ତାଦେର ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛିଲ । ଏଥାନେଓ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦିଯେ ଛାତ୍ରଦେର ଭତ୍ତି ହତେ ହତୋ । ଶିକ୍ଷା ଶେଷେ ତାଦେର ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରା ହତୋ । ବିକ୍ରମଶୀଲ ଛିଲ ବଜ୍ର୍ୟାନ ବୌଦ୍ଧ ମତଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକଟା ବଡ଼ୋ କେନ୍ଦ୍ର । ଏର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରେ ଛିଲ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପାଙ୍ଗୁଲିପି । ଦୀପଙ୍କର-ଶ୍ରୀଜାନ (ଅତୀଶ) ଛିଲେନ ଏହି ମହାବିହାରେ ଅନ୍ୟତମ ଏକଜନ ମହାଚାର୍ୟ । ଏହି ମହାବିହାରକେଓ ତ୍ରୈଦଶ ଶତକେ ତୁର୍କି ଅଭିଯାନକାରୀରା ଧବଂସ କରେଛିଲ ।

ପାଲଯୁଗେର ଶିଳ୍ପରୀତିକେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଶିଳ୍ପରୀତି ବଲା ହ୍ୟ । ଏହି ରୀତିର ପୂର୍ବମୂରି ଛିଲ ଗୁପ୍ତଯୁଗେର ଶିଳ୍ପକଳା । ପାଲ ଆମଲେର ସ୍ଥାପତ୍ୟେର ମଧ୍ୟେ ଛିଲ ସ୍ତୁପ, ବିହାର ଏବଂ ମନ୍ଦିର । ତବେ ପ୍ରକୃତିର କୋପେ ଏବଂ ମାନୁଷେର ରୋଧେ ସେଇ ସ୍ଥାପତ୍ୟେର ଆର ବିଶେଷ କିଛୁ ନେଇ ।

ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତେ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଜୈନଦେର ମଧ୍ୟେ ସ୍ତୁପ ନିର୍ମାଣେ ରୀତି ଛିଲ । ବିଶେଷ କରେ ବୌଦ୍ଧରା ବହୁ ସ୍ତୁପ ତୈରି କରେଛିଲ । ଏଗୁଲି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିତେ ଛିଲ ଗୋଲାକାର, ପରେ ଅନେକଟା ମୋଚାର ଖୋଲାର ମତୋ ଶଙ୍କୁ ଆକୃତିର ହ୍ୟେ ପଡ଼େ ।

ପାଲ ରାଜସ୍ଥେ ତୈରି ସ୍ତୁପଗୁଲୋ ଶିଖରେର ମତୋ ଦେଖିତେ ଛିଲ । ବର୍ତମାନେ ବାଂଲାଦେଶେର ଢାକା ଜେଲାର ଆସରଫପୁର ଥାମେ, ରାଜଶାହୀର ପାହାଡ଼ପୁରେ, ଚଟ୍ଟଥାମେ, ପଞ୍ଚମବଙ୍ଗେର ବର୍ଧମାନ ଜେଲାଯ ଭରତପୁର ଥାମେ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୁପ ପାଓଯା ଗେଛେ । ତବେ ସ୍ତୁପ ନିର୍ମାଣେ ବାଂଲାଯ କୋନୋ ମୌଲିକ ଭାବନାର ବିକାଶ ଲକ୍ଷ କରା ଯାଇନି । ବିହାରଗୁଲି ଛିଲ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଦେର ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଭାନୁଚାର୍ଯ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର । ପାହାଡ଼ପୁରେ ସୋମପୁରୀ ବିହାରେ ମନ୍ଦିର ଛିଲ ପାଲ ଆମଲେର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବିହାର । ମନ୍ଦିରେର ମଧ୍ୟେ ସୋମପୁରୀ ବିହାରେ ମନ୍ଦିର ଛିଲ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବିହାର । ଚାରକୋଣା ଏହି ମନ୍ଦିରେ ଗର୍ଭଗୃହ, ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପଥ, ମଞ୍ଚପ, ସୁଉଚ୍ଚ ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଛିଲ । ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଡ଼ାମାଟିର ଇଟ ଏବଂ କାଦାର ଗାଁଥୁନି ବ୍ୟବହାର କରା ହ୍ୟେଛିଲ ।



ছবি ৩.৩ : বালীর মৃত্যু (খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক)। [(ক) সূর্য (খ্রিঃ ৭ম-৮ম শতক)] [(খ) মঙ্গলবজ্র মণ্ডল (খ্রিঃ ১১শ শতক)]
[(গ) চন্দ্র (খ্রিঃ ১১শ শতক)] [(ঘ) মহিষাসুরমর্দিনী (খ্রিঃ ১২শ শতক)] [(ঙ) উমা-মহেশ্বর (খ্রিঃ ১২শ শতক)]

পাল আমলের ভাস্কর্যগুলি ঐ আমলের শিল্পের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পাহাড়পুর প্রত্নক্ষেত্রে এর সবচেয়ে ভালো নির্দেশন পাওয়া যায়। এখানে মূল মন্দিরের গায়ে পাথরের ফলক রয়েছে যার মধ্যে স্থানীয় রীতির প্রভাব স্পষ্ট। ফলকগুলিতে রাধা-কৃষ্ণ, যমুনা, বলরাম, শিব, বৃন্দ অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি আছে। এই দেব-দেবীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের প্রভাব অনেক বেশি। পাল রাজারা নিজেরা বৌদ্ধ হলেও বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি উভয়ের পৃষ্ঠপোষণ করতেন। ভাস্কর্যের মধ্যে পোড়ামাটির শিল্পসামগ্ৰীও ছিল। এগুলি ছিল স্থানীয় লোকায়ত শিল্পের প্রতীক। এগুলিতে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, সমাজজীবন, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি ফুটে উঠেছে।

খ্রিস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের আগে আঁকা কোনো ছবি আজ আর পাওয়া যায় না। যে ছবিগুলি পাওয়া গেছে সেগুলো বৌদ্ধধর্মের পাণ্ডুলিপি অলংকরণ করার জন্য আঁকা হয়েছিল। এই ছবিগুলি আকারে ছোটো কিন্তু এগুলি পরের যুগের অগুচ্ছের (মিনিয়োচার) মতো সূক্ষ্ম রেখাময় নয়। বরং এগুলির সঙ্গে প্রাচীরগাত্রে আঁকা ছবির মিল আছে।



৩.৪ :

পালযুগে নেখা অষ্টসহস্রিকা
পঞ্চাপার্বতা পুরির একটি
পাতার আঁকা ছবি

পাল যুগে খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতকে বরেন্দ্রভূমির ধীমান এবং তাঁর ছেলে বীটপাল ছিলেন প্রসিদ্ধ শিঙ্গী। তাঁরা ধাতব শিঙ্গে, ভাস্কর এবং চিত্রশিঙ্গে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

সেন রাজাদের আমলে স্থানীয় গ্রাম শাসনব্যবস্থায় অবনতি ঘটেছিল। স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে রাষ্ট্রের যোগাযোগ শিথিল হয়ে এসেছিল। রাষ্ট্র অসংখ্য ছোটো-ছোটো খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। সেন আমলের লেখগুলোতে রাজ্জী বা রাজমহিষীদের উল্লেখ আছে। অর্থাৎ, রাজপরিবারের মহিলাদের গুরুত্ব বেড়েছিল।

সমাজে সাধারণ মানুষের জীবন ছিল মোটামুটি সচ্ছল। তবে ভূমিহীন ব্যক্তি ও শ্রমিকের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। এর প্রমাণ আছে সে যুগের সাহিত্যে। পাল আমলের তুলনায় সেন আমলে বর্ণব্যবস্থা কঠোর, অনমনীয় হয়ে পড়েছিল।

পাল যুগের মতো সেন যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রচার এবং প্রসার ঘটেনি। সেন রাজারা ব্রাহ্মণ ধর্মকেই প্রাধান্য দিতেন। ব্রাহ্মণধর্মের মধ্যে বৈদিক ধর্ম ও পৌরাণিক ধর্ম এই দুইয়ের মিশ্রণ ঘটেছিল। ইন্দ্র, অগ্নি, কুবের, সূর্য, বৃহস্পতি, গঙ্গা, যমুনা, মাতৃকা, শিব, বিশ্বর পুজো করা হতো। সেন রাজাদের মধ্যে লক্ষ্মণসেন ছিলেন বৈষ্ণব, তবে তার পূর্বসূরিয়া ছিলেন শৈব।

বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব থাকলেও বৌদ্ধরা আগেকার যুগের মতো সুযোগ-সুবিধা পেত না। ব্রাহ্মণরাই সমাজপতি হিসাবে সুবিধা ভোগ করত। আবার, ব্রাহ্মণদের মধ্যে একাধিক উপবিভাগ ছিল। অ-ব্রাহ্মণদের সবাইকে ‘সংকর’ বা ‘শূন্দ’ হিসাবে ধরা হতো। ব্রাহ্মণরা অ-ব্রাহ্মণদের কাজ করতে পারত, কিন্তু অব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণদের কাজগুলি করতে পারত না। এ ছাড়া, সেন আমলে আদিবাসী-উপজাতি মানুষদের কথাও জানা যায়।

সেন যুগে লক্ষণসেনের রাজসভার কবি জয়দেব সবচেয়ে বিখ্যাত সাহিত্যিক। তাঁর গীতগোবিন্দম্ কাব্যের বিষয় ছিলো রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের কাহিনি। লক্ষণসেনের রাজসভার আর এক কবি ধোয়ী লিখেছিলেন পবনদুত কাব্য। এ যুগের আরো তিনজন কবি ছিলেন গোবর্ধন, উমাপতিধর এবং শরণ। এই পাঁচজন কবি একসঙ্গে লক্ষণসেনের রাজসভার পঞ্চরত্ন ছিলেন। অযোদ্ধশ শতকের গোড়ায় কবি শ্রীধর দাস কর্তৃক সংকলিত সদৃক্ষিকণ্ঠমৃত প্রান্থে বিভিন্ন কবিদের লেখা কবিতা স্থান পেয়েছে।

সেন যুগের ব্রাহ্মণ্যধর্মী কঠোর অনুশাসনের সঙ্গে সাহিত্যেরও যোগ ছিল। রাজা বল্লালসেন এবং রাজা লক্ষণসেন দুজনেই স্মৃতিশাস্ত্র লিখেছিলেন। বল্লালসেনের লেখা চারটে বইয়ের মধ্যে দানসাগর এবং অদ্বুতসাগর বই দুটি পাওয়া গেছে। লক্ষণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধ বৈদিক নিয়ম বিষয়ে ব্রাহ্মণসর্বস্ব নামে একটা বই লিখেছিলেন। অভিধানপ্রণেতা সর্বানন্দ এবং গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিদ শ্রীনিবাস ছিলেন সেন যুগের আরো দুজন লেখক।

টুকরো কথা

ডাক ও খনাপ রচন

প্রাচীন বাংলার সমাজে কৃষ্ণ ছিল প্রধান জীবিকা। ডাক ও খনাপ রচন-এর ছড়াগুলো তারই প্রমাণ। সাধারণ মানুষের মুখে মুখে এই রচন বা ছড়াগুলি চলত। কোন ঝুতুতে কী ফসল বুনতে হবে, কোন ফসলের জন্য কেমন মাটি দরকার, কতটা বৃষ্টির দরকার— এসব নানা কিছুর হিসেব এই ছড়াগুলিতে আছে। যেমন :

ক) মেঘ করে রাত্রে আর

দিনে হয় জল। তবে
জেনো মাঠে যাওয়াই
বিফল।

খ) খনা ঢেকে ব'লে যান।
রোদে ধান ছায়ার পান।

গ) খনা বলে চাষার পো
(ছেলে)। শরতের শেষে
সরিষা রো।

ঘ) দিনে রোদ রাতে জল।
তাতে বাড়ে ধানের বল।

ঙ) অগ্রহায়ণে যদি না হয়
বৃষ্টি। তবে না হয়
কাঁটালের সৃষ্টি।

এমন আরো অনেক রচন
আছে। সাধারণ মানুষের
মুখের ভাষায় এগুলো লেখা।
তারা এই ছড়াগুলো থেকেই
নানা দরকারি জ্ঞান পেত।

টুকরো কথা

সাহিত্য ও সমাজ

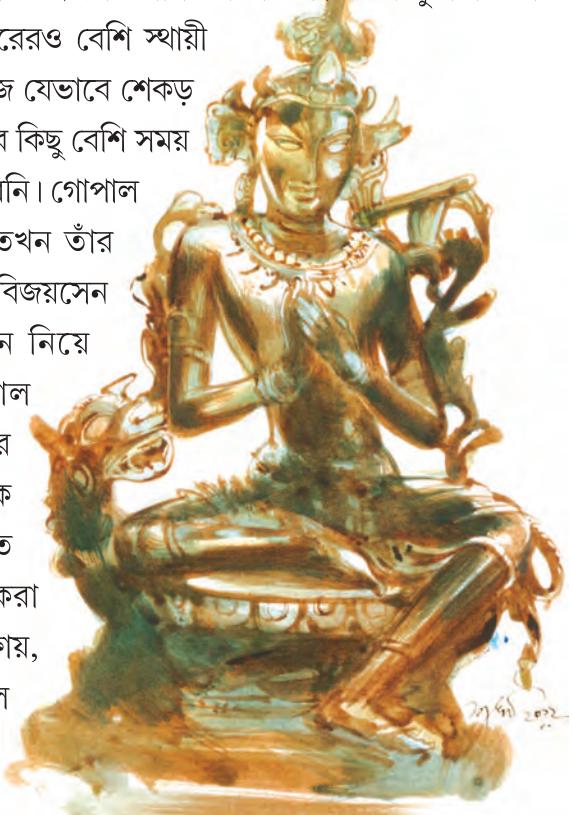
সাহিত্য হলো সমাজের আয়না। একদিকে রাজা লক্ষণসেনের রাজসভার কবিদের সংস্কৃত ভাষায় লেখা কাব্যে ধনী ও বিলাসী জীবনের ছবি ফুটে উঠেছিল। রাজা লক্ষণসেনকে কুঁঠের সঙ্গে তুলনা করে কবিরা স্তুতি করেছেন। আবার, গ্রামের সম্পন্ন কৃষকের জীবনযাত্রার ছবি ফুটেছে এই রকম একটি রচনায় : বর্ষার জল পেয়ে চমৎকার ধান গজিয়েছে, গোরুগুলো ঘরে ফিরে এসেছে, খেতে ভালো আখ হয়েছে, আর কোনো ভাবনা নেই। অন্যদিকে, গরিব মানুষের জীবনেরও ছায়া পড়েছে সমসাময়িক সাহিত্যে। খিদেয় কাতর শিশু, গরিব লোকের ভাঙা কলসি, ছেঁড়া কাপড় এই সব দৃশ্য ব্যবহার করেছেন কবিরা। বৃষ্টিবহুল বাংলাদেশের কুঁঠেঘরের বাসিন্দা গরিব মানুষের জীবনের কষ্ট ধরা পড়েছে এই রকম একটি লেখায় : কাঠের খুঁটি নড়েছে, মাটির দেয়াল গলে পড়েছে, চালের খড় উড়ে যাচ্ছে, কেঁচো খুঁজতে আসা ব্যাঙে আমার ভাঙা ঘর ভরে গেছে। চর্যাপদের একটি কবিতায় আছে— ‘হাঁড়িতে ভাত নেই, নিত্য উপবাস’। এটাই চরম দারিদ্র্যের নিদর্শন।



সেন যুগের সাহিত্য থেকে
সেই সময়ের বাংলার যে
দুরকম ছবি পাওয়া গেছে,
এর থেকে সেযুগের সমাজ
কেমন ছিল বলে তোমার
মনে হয়?

হ্রস্ব ৩.৫ :
পালযুগের একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি
অবনমনে আঁকা হ্রস্ব

এবারে বাংলায় পাল এবং সেন শাসনকালের সংক্ষেপে তুলনা করা
যেতে পারে। চারশো বছরেরও বেশি স্থায়ী
পাল শাসন বাংলার সমাজে যেভাবে শেকড়
গেড়েছিল, একশো বছরের কিছু বেশি সময়
স্থায়ী সেন শাসন তা পারেনি। গোপাল
যখন রাজা হয়েছিলেন তখন তাঁর
পিছনে জনসমর্থন ছিল। বিজয়সেন
এমন কোনো জনসমর্থন নিয়ে
ক্ষমতায় আসেননি। পাল
শাসকরা যেভাবে বাংলার
সমাজে নিজেদের শাসনকে
প্রহণযোগ্য করে তুলতে
পেরেছিলেন, সেন শাসকরা
তা পারেননি। শিক্ষা-দীক্ষায়,
ধর্মচর্চায়, শিল্পকলায় পাল
যুগ অনেক এগিয়ে ছিল।



৩.৩ ভারত ও বহির্বিশ্ব : খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক

খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষে বহু বিচ্চিরি সংস্কৃতির
গেনদেন এবং সংঘাত দেখা যায়। আবার ভারতীয় সংস্কৃতির বহু নমুনা দক্ষিণ-
পূর্ব এশিয়া, তিব্বত এবং চিন প্রভৃতি অঞ্চলে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ যায় নানারকম
সংস্কৃতির মেলামেশায় ভারতের বৈচিত্র্যময় জীবনযাপন গড়ে উঠেছিল। সেই
জীবনযাপন স্থির ছিল না, প্রয়োজনে নিজেকে বদল করেছিল। ফলে আজও
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে নানান বৈচিত্র্যময় স্থানীয় মানুষদের দেখতে পাবে। এই
বৈচিত্র্যগুলি ভালোভাবে বুঝে সেগুলি টিকিয়ে রাখা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

ইসলামীয় সংস্কৃতি ভারতবর্ষে আসার ফলে ভারতের জ্ঞানচর্চার লাভ হয়েছিল
বেশি। দুই সংস্কৃতির মেলামেশার ছাপ পড়েছিল সমাজ, সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রীয়
ব্যবস্থায়। ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, সংগীত, চিত্রকলা প্রভৃতি থেকে
প্রশাসনিক ধ্যান-ধারণা ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে। এই বৌদ্ধাপড়া একমুখী
ছিল না। উভয় উভয়কেই প্রভাবিত করেছিল। কখনো কখনো সংঘাতও বেঁধেছিল।
তবে অনেকদিনের মেলামেশায় আস্তে আস্তে মিশে যায় দুটি ধারাই।



ছবি ৩.৬ : তিব্বতের একটি বৌদ্ধ গুরুর আঁকা দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান (অতীশ)-এর প্রতিকৃতি (আনুমানিক ১১০০খ্রঃ)। বাঁহাতে একটি তালপাতার পুর্ণ ধরে অতীশ তাঁর আগ্নেয়ে পড়াচ্ছে।

টুকরো কথা

দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান [অতীশ]

ভারত এবং বহি�ারতের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার অন্যতম উদাহরণ হলেন দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান (অতীশ)। বাঙালি বৌদ্ধ আচার্যদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত এবং শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত অতীশের (আনুমানিক ১৮০-১০৫৩ খ্রঃ) জন্ম বঙ্গাল অঞ্চলের বিক্রমগ্নিপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে। তিনি ব্রাহ্মণ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না বলে তাঁর বাড়ি আজও ‘নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা’ নামে পরিচিত। ওদন্তপুরী বিহারে আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান নামে পরিচিত হন। তিনি সম্ভবত বিক্রমশীল, ওদন্তপুরী এবং সোমপুরী মহাবিহারের আচার্য ও অধ্যক্ষ ছিলেন। তিব্বতের রাজা জ্ঞানপ্রভের

ଅନୁରୋଧେ ତିନି ଦୁର୍ଗମ ହିମାଲୟ ଅତିକ୍ରମ କରେ ତିବତେ ଯାନ (୧୦୮୦ ଖ୍ରୀସ୍ଟାବ୍ଦ)। ସେଥାନେ ତିନି ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରେନ। ତା'ରଇ ଚେଷ୍ଟାଯ ତିବତେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଜନପିଯ ହ୍ୟ। ତିନି ଅନେକ ସଂକ୍ଷିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭୋଟ ଭାଷାଯ ଅନୁବାଦ କରେନ। ତା'ର ମୂଳ ସଂକ୍ଷିତ ଲେଖାଗୁଲି ନା ପାଓଯା ଗେଲେଓ ତିବତି ଭାଷାଯ ଅନୁବାଦଗୁଲି ପାଓଯା ଯାଯା। ଅତୀଶ ତିବତେ ବୁଦ୍ଧର ଅବତାର ହିସାବେ ପୂଜିତ ହନ। ତିବତେର ରାଜଧାନୀ ଲାସାର କାହେ ତା'ର ସମାଧିସ୍ଥାନ ପାବିଏ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର। ସମଗ୍ର ବାଂଲା-ବିହାରେ ଓପର ତା'ର ଗଭିର ପ୍ରଭାବ ଛିଲ। ତାଇ ଏଦେଶେର ବୌଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟରା ମନେ କରେଛିଲେନ ଯେ ତିନି ତିବତେ ଚଲେ ଗେଲେ ଭାରତବର୍ଷ ଅନ୍ଧକାର ହ୍ୟେ ଯାବେ। ଅନେକ ପରେ କବି ସତ୍ୟୋଦ୍ଧରଣାଥ ଦତ୍ତ ଏହି ଅସୀମ ପ୍ରତିଭାଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କେ ଲିଖେଛେ ‘ବାଙ୍ଗଲି ଅତୀଶ ଲଞ୍ଛିଲ ଗିରି ତୁଯାରେ ଭୟକର, ଜ୍ଞାଲିଲ ଜ୍ଞାନେର ଦୀପ ତିବତେ ବାଙ୍ଗଲି ଦୀପଙ୍କର’।

ଏହି ସମୟେ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ, ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟେ ଚର୍ଚା ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼େଛିଲ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏଶ୍ଯାଯା। ଭାରତ ମହାସାଗରକେ କେନ୍ଦ୍ର କରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମପ୍ରଚାରେର ମାଧ୍ୟମେ ଏହି ସାଂକ୍ଷତିକ ଯୋଗାଯୋଗ ତୈରି ହ୍ୟେଛିଲ। କଷ୍ମୋଡ଼ିଆୟ ରାମାଯଣେର ଘଟନାବଳି ନିଯେ ନୃତ୍ୟ-ସଂଗୀତ ଖୁବଇ ଜନପିଯ ଛିଲ। ଖ୍ରୀସ୍ଟୀ ଅଷ୍ଟମ ଶତବୀତେ ହିନ୍ଦୋନେଶ୍ୟାର ବୋରୋବୋଦୁରେର ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହ୍ତ ବୌଦ୍ଧକେନ୍ଦ୍ର ଛିଲ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତକେର ପ୍ରଥମ ଭାଗେ କଷ୍ମୋଡ଼ିଆର ଆଜ୍ଞକାରଭାଟେ ବିଖ୍ୟାତ ବିଦ୍ୟୁ ମନ୍ଦିର ତୈରି ହ୍ୟ। ପରେ ଏଥାନେ ବୌଦ୍ଧରାଓ ଉପାସନା କରତ । ଏହି ମନ୍ଦିରେର ଗାୟେ ରାମାଯଣ ଓ ମହାଭାରତେର ବିଭିନ୍ନ ଗଙ୍ଗା ଖୋଦାଇ କରା ହ୍ୟେଛେ । ତବେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏଶ୍ଯାର ଦେଶଗୁଲିର ସାଥେ ଭାରତବର୍ଷେ ସମ୍ପର୍କ ଏକମୁଖୀ ଛିଲ, ସେଟା ଭାବା ଉଚିତ ନଯ । ପାନପାତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଶ କିଛୁ ଫ୍ରେଶ କିଭାବେ ଫଳାତେ ହ୍ୟ ତା ଏହିବେଳେ ପ୍ରତିବେଶୀ ଦେଶଗୁଲିର ଥେକେ ଭାରତ ଶିଖେଛିଲ । ଏହି ସବ ଦେଶଗୁଲିର ଶିଳ୍ପ, ଧର୍ମ, ଲିପି ଏବଂ ଭାଷାର କ୍ଷେତ୍ରେ ଭାରତରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ଛିଲ । କିନ୍ତୁ ସେଥାନକାର ସମାଜ-ସଂକ୍ଷତି ତାର ନିଜସ୍ଵ ମେଜାଜ ବଜାଯ ରେଖେଛିଲ । ତାର ମଧ୍ୟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉପାଦାନେର ସାଥେ ଭାରତେର ବୈଚିତ୍ର୍ୟମ୍ୟ ସଂକ୍ଷତିର ଛୋଯାଓ ଲେଗେଛିଲ ।



ভেবে দেখো



ঝুঁঁজে দেখো



১। নীচের নামগুলির মধ্যে কোনটি বাকিগুলির সঙ্গে মিলছে না তার তলায় দাগ দাও:

- (ক) নাড়ু, চোল, উর, নগরম।
- (খ) ওদন্তপুরী, বিক্রমশীল, নালন্দা, জগদ্দল, লখনৌতি।
- (গ) জয়দেব, ধীমান, বীটপাল, সন্ধ্যাকর নন্দী, চক্রপাণিদত্ত।
- (ঘ) লুইপাদ, অশ্বঘোষ, সরহপাদ, কাহ্প্যাদ।

২। নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঙ্গে তার নীচের কোন ব্যাখ্যাটি তোমার সবচেয়ে মানানসই বলে মনে হয়?

(ক) বিবৃতি : বাংলার অর্থনীতি পাল-সেন যুগে কৃষি নির্ভর হয়ে পড়েছিল।

ব্যাখ্যা-১ : পাল-সেন যুগে বাংলার মাটি আগের যুগের থেকে বেশি উর্বর হয়ে গিয়েছিল।

ব্যাখ্যা-২ : পাল-সেন যুগে ভারতের পশ্চিম দিকের সাগরে আরব বণিকদের দাপট বেড়ে গিয়েছিল।

ব্যাখ্যা-৩ : পাল-সেন যুগে রাজারা কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের উপর কর নিতেন।

(খ) বিবৃতি : দক্ষিণ ভারতে মন্দির ঘিরে লোকালয় ও বসবাস তৈরি হয়েছিল।

ব্যাখ্যা-১ : রাজা ও অভিজাতরা মন্দিরকে নিষ্ক্রিয় জমি দান করতেন।

ব্যাখ্যা-২ : নদী থেকে খাল কেটে সোচব্যবস্থার উন্নতি করা হয়েছিল।

ব্যাখ্যা-৩ : দক্ষিণ ভারতে রাজারা অনেক মন্দির তৈরি করেছিলেন।

(গ) বিবৃতি : সেন যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসার করে গিয়েছিল।

ব্যাখ্যা-১ : সেন রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন।

ব্যাখ্যা-২ : সেন রাজারা ব্রাহ্মণ ধর্মকেই প্রাধান্য দিতেন।

ব্যাখ্যা-৩ : সমাজে শুন্দরের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল।

৩। সংক্ষেপে (৩০-৫০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :

(ক) দক্ষিণ ভারতে খিস্টীয় নবম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে বাণিজ্যের উন্নতি কেন ঘটেছিল?

(খ) পাল ও সেন যুগে বাংলায় কী কী ফসল উৎপন্ন হতো? সেই ফসলগুলির কোন কোনটি এখনও চাষ করা হয়?

(গ) রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজসভার সাহিত্যচর্চার পরিচয় দাও।

(ঘ) পাল শাসনের তুলনায় সেন শাসন কেন বাংলায় কম দিন স্থায়ী হয়েছিল?

৪। বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর লেখো :

(ক) ভারতের সামন্ত ব্যবস্থার ছবি আঁকতে গেলে কেন তা একখানা ত্রিভুজের মতো দেখায়? এই ব্যবস্থায় সামন্তরা কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করত?

- (খ) পাল ও সেন যুগের বাংলার বাণিজ্য ও কৃষির মধ্যে তুলনা করো।
- (গ) পাল আমলের বাংলার শিল্প ও স্থাপত্যের কী পরিচয় পাওয়া যায় তা লেখো।
- (ঘ) পাল ও সেন যুগে সমাজ ও ধর্মের পরিচয় দাও।

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে):

- (ক) যদি তুমি খ্রিস্টীয় দশম শতকের বাংলার একজন কৃষক হও, তাহলে তোমার সারাদিন কেমন ভাবে কাটবে তা লেখো।
- (খ) মনে করো তুমি বিক্রমশীল মহাবিহারের একজন ছাত্র। তোমার শিক্ষক দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান (অতীশ) তিব্বতে চলে যাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে তুমি কী কথা বলবে? তিনিই বা তোমাকে কী বলবেন? এই নিয়ে একটি কাল্পনিক কথোপকথন লেখো।

এ বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে পড়ার মাঝে মজার কাজ ও ভেবে বলো শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর কল্পনা করে লেখো শীর্ষক কৃত্যালি গুলি (**Activities**) শ্রেণিকক্ষে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন (**Formative Evaluation**)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।



ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ

ଦିଲ୍ଲି ସୁଲତାନି ଖୁର୍ଦ୍ଦ୍ରୀ-ଆଫଗାନ ଶନ୍ମନ

୪.୧ ସୁଲତାନ କେ?

ମହମ୍ମଦ ଘୁରି ମାରା ଗେଲେ (୧୨୦୬ ଖ୍ରୀ) ତାର ଜୟ କରା ଅଞ୍ଚଳଗୁଣି ଭାଗ ହେଁ ଯାଯ ତାର ଚାରଜନ ଅନୁଚରେର ମଧ୍ୟେ । ତାଜୁବୁଦ୍ଧିନ ଇଯାଲଦୁଜ ପେଲେନ ଗଜନିର ଅଧିକାର । ନାସିରଉଦ୍ଦିନ କୁବାଚା ମୁଲତାନ ଓ ଉଛ-ଏର ଶାସକ ହେଁ ବସଲେନ । ବଖତିଆର ଖଲିଫା ବାଂଲାଦେଶେର ଶାସକ ହନ । ଆର ଲାହୋର ଓ ଦିଲ୍ଲିର ଅଧିକାର ଥାକେ କୁତୁବଉଦ୍ଦିନ ଆଇବକେର ହାତେ ।

ଦିଲ୍ଲିକେ କେନ୍ଦ୍ର କରେ ଆଇବକ ସୁଲତାନି ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରଲେନ । ସୁଲତାନ ଏକଟା ଉପାଧି । ତୁର୍କି ଶାସକଙ୍କ ଅନେକେଇ ଏଇ ଉପାଧି ବ୍ୟବହାର କରତେନ । ଆଦିତେ ଆରବି ଭାଷାଯ ସୁଲତାନ ଶବ୍ଦେର ମାନେ କର୍ତ୍ତୃ, କ୍ଷମତା ଏହିବା । ସେ ଅଞ୍ଚଳେର ମଧ୍ୟେ ସୁଲତାନେର କର୍ତ୍ତୃ ଚଲତ, ତାକେ ବଲା ହୁଯ ସୁଲତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ସୁଲତାନି । ଦିଲ୍ଲିକେ କେନ୍ଦ୍ର କରେ ଭାରତବର୍ଷେ ସୁଲତାନଦେର କ୍ଷମତା ଓ କର୍ତ୍ତୃ ବଜାୟ ଛିଲ । ତାଇ ତାର ନାମ ଦିଲ୍ଲି ସୁଲତାନି ବା ସୁଲତାନ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ।

୪.୨ ଖଲିଫା ଓ ସୁଲତାନେର ସମ୍ପର୍କ

ହଜରତ ମହମ୍ମଦର ମୃତ୍ୟୁର ପର ଥେକେ ଇମଲାମୀଯ ଜଗତେ ପ୍ରଧାନ ଶାସକ ଛିଲେନ ଖଲିଫା । ଇମଲାମେର ଆୟୋଜନିକ ଯତ ଅଞ୍ଚଳ ଛିଲ, ତାର ମୁଲ ଶାସକ ତିନିଟି । ଖଲିଫା ଆବାର ଧର୍ମଗୁରୁଓ ବଟେ । (ଏ ବିଷୟେ ତୋମରା ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟେ ୨୦ନଂ ପୃଷ୍ଠାତେ ପଡ଼େଛୋ) ଫଳେ, ଦିଲ୍ଲିର ସୁଲତାନିର ଉପରେଓ ଆଦିତେ ଖଲିଫାରଙ୍କ ଅଧିକାର ଛିଲ ।

ବ୍ୟାପାର ଶତକେ ମୁସଲମାନଦେର କର୍ତ୍ତୃ ଛିଲ ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳେ । ଏକଜନ ଖଲିଫାର ପକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳେ ଶାସନ କରା ସମ୍ଭବହୀଁ ଛିଲ ନା । ତାଇ ଖଲିଫାର ଥେକେ ଅନୁମୋଦନ ନିଯେ ନାନାନ ଅଞ୍ଚଳେ ନାନାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସନ କରତେନ । ତେମନିଟି ଭାରତବର୍ଷ ବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନେ ଶାସକ ଛିଲେନ ସୁଲତାନ । କିନ୍ତୁ, ଏମନିଟେ ସୁଲତାନରା ଖଲିଫାକେ ସେ ଖୁବ ମେନେ ଚଲତେନ, ତା ନଯ । ତବେ ମାଝେମଧ୍ୟେଇ କେ ସୁଲତାନ ହବେନ, ଏହି ନିଯେ ଗୋଲମାଲ ପାକିଯେ ଉଠତ । ଧରା ଯାକ, କୋନୋ ତୁର୍କି ସେନାପତି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜୟ କରେଛେ । ସେଇ ଅଞ୍ଚଳଟି ତିନି ନିଜେଇ ଶାସନ କରତେ ଚାନ । ତଥନ ଏହି ସେନାପତି ଖଲିଫାର କାହେ ଉପହାର ପାଠିଯେ ସୁଲତାନ ହୁଓଯାର ଆରଜି ଜାନାତେନ । ତାର ମାନେ ଖଲିଫାର ଅନୁମୋଦନେର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଛିଲ । ସେଇ ଅନୁମୋଦନକେ ବାକିରା ନାକଚ କରତେ ପାରତ ନା । ତେମନିଟି ଏକଟି ଗୋଲମାଲ

ଟୁକରୋ କଥା

ଶାଜାକ୍ତେର ଉପାଧି

ରାଜା, ସନ୍ତାଟ, ସୁଲତାନ ଏହିବର ଶବ୍ଦଗୁଣିଇ ଶାସକରେ ଉପାଧି । ଶାସକରେ ଧର୍ମ ଓ ଦେଶ ଏବଂ ଶାସନରେ କ୍ଷମତାର ହେବକେରେ ଉପାଧିଗୁଣିର ବ୍ୟବହାର ବଦଳେ ଯେତ । ଯେମନ, ରାଜା ହେଲେନ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ । ରାଜା କଥାଟା ସଂକ୍ଷତ ଥେକେ ଏସେହେ । ତାଇ ଭାରତବରେ ଆ-ମୁସଲମାନ ଶାସକଦେର ରାଜା ବଲା ହତୋ । ଆବାର ସେ ରାଜା ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରେ ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳେର ଶାସକ ହେବେନ, ତିନି ସନ୍ତାଟ । ସାନ୍ତାଜ୍ୟର ଶାସକ ତିନି । ସାନ୍ତାଜ୍ୟ ଏକଟି ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳ । ତାର ସବ ଦେଖଭାଲ ସନ୍ତାଟର ଦାୟିତ୍ୱ । ଏକଟି ସାନ୍ତାଜ୍ୟର ଭେତରେ ରାଜ୍ୟ ଥାକତେଓ ପାରେ । ରାଜା ସନ୍ତାଟର ଚେଯେ ସମ୍ମାନ ଓ କ୍ଷମତାଯ ଛୋଟୋ ।

ସୁଲତାନରା ଛିଲେନ ତୁର୍କି । ସେଇନ୍ୟାଇ ରାଜା ବା ସନ୍ତାଟ ଉପାଧି ନା ନିଯେ, ସୁଲତାନ ଉପାଧି ନିଲେନ । ତାଇ କୁତୁବଉଦ୍ଦିନ ଆଇବକକେ ସୁଲତାନ ବଲା ହୁଯ ।

ঠিতীত ও প্রতিষ্ঠা

টুকরো কথা

খ্রিস্ট

খৃষ্টবা কথাটির আসল মানে হল ভাষণ। কোনো সুলতানের শাসনকালে মসজিদের ইমাম একটি ভাষণ পড়তেন। শুন্বারের দুর্যোগের নামাজের (জোহরের নামাজ) পরে সবার সামনে এই ভাষণ বা খৃষ্টবাটি পাঠ করা হতো। তাতে সমকালীন খলিফাও সুলতানের নামের উল্লেখ থাকত। এর মধ্যে দিয়ে সুলতান যে নিয়ম মেনে শাসক হয়েছেন সেটা বারবার জানান দেওয়া হতো।

কথার মানে

আমির : উচু বংশে জন্ম, বড়োলোক ব্যক্তি। তবে দিল্লির সুলতানির ইতিহাসে শাসনকাজে নিযুক্ত, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমির বলা হতো। আমির শব্দেরই বহুবচন হলো ওমরাহ (আমিরগণ)।

দুরবাশ : স্বাধীন শাসনের প্রতীক দণ্ড।

খিলাত : আনুষ্ঠানিক পোশাক।

পাকিয়ে উঠল দিল্লির সুলতানিতেও। তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ গজনির শাসক হিসাবে দিল্লির উপরেও অধিকার কায়েম করতে চাইলেন। কুতুবউদ্দিন তাতে রাজি হলেন না। গজনির সঙ্গে দিল্লির সব সম্পর্ক বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু, কুতুবউদ্দিনের জামাই ইলতুৎমিশ যখন সুলতান হলেন (৪.৩ একক দেখো), তখনই গোলমাল জটিল হয়ে উঠল। একে তো ইলতুৎমিশ কুতুবউদ্দিনের জামাই, ছেলে নন। তার উপরে, নাসিরউদ্দিন কুবাচা মুলতান থেকে এসে লাহোর ও পাঞ্জাবের খানিক অংশ দখল করে নিলেন। অন্যান্য অঞ্চলেও ক্ষমতাবান তুর্কিরা (আমির বলা হতো এদের) কর্তৃত করতে লাগলেন। ফলে ইলতুৎমিশ পড়লেন বিপদে। কেউই তাঁকে দিল্লির সুলতান বলে মানতে চায় না। তারা তার অধিকার নিয়েও প্রশ্ন তোলে।

তখন ইলতুৎমিশ দিল্লির সুলতানিতে নিজের অধিকার বজায় রাখতে খলিফার অনুমোদন প্রার্থনা করেন। খলিফার কাছে নানান উপহার পাঠান। তার বদলে বাগদাদের খলিফা ইলতুৎমিশকে দুরবাশ ও খিলাত পাঠান, এবং দিল্লির সুলতানিতে ইলতুৎমিশের কর্তৃত্বকে অনুমোদন দেন।

টুকরো কথা

খলিফার অনুমোদন

ইলতুৎমিশ খলিফার থেকে অনুমোদন পান ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে। সুলতানরা তাঁদের মুদ্রায় নিজেদের ‘খলিফার প্রতিনিধি’ বলে খোদাই করাতেন। প্রতি শুন্বারে নামাজে খলিফার নাম বলতেন। মহম্মদ বিন তুঘলক প্রথমে তাঁর আমলের মুদ্রায় খলিফার নাম খোদাই করা বন্ধ করে দেন। তবে পরে ঘন ঘন বিদ্রোহে জেরবার হয়ে তিনি আবার নিজের মুদ্রায় খলিফার নাম খোদাই করার আদেশ দেন। খলিফার থেকে অনুমোদন প্রাপ্ত আনিয়ে নেন।

ফিরোজ শাহ তুঘলকও দু-বার খলিফার অনুমোদন পান। এরপর থেকে অবশ্য ভারতে খলিফার থেকে অনুমোদন চাওয়ার প্রথা বন্ধ হয়ে যায়। আর মুঘল বাদশাহরা ভারতের বাইরের কাউকে মর্যাদা ও ক্ষমতায় নিজেদের সমান বলে মনেই করতেন না।

এভাবে যখনই শাসন ও অধিকারের ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠত, তখনই দিল্লির সুলতানরা খলিফার আনুগত্য স্বীকার করে তার অনুমোদন চাইতেন। তবে, কাজের দিক থেকে দিল্লির সুলতানরা প্রায় চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। খলিফারা কেউই দুর হিন্দুস্তানের ব্যাপারে নাক গলাতেন না। এভাবেই দিল্লির সুলতানি নিজের মতো করে ভারতবর্ষে বা হিন্দুস্তানে প্রায় তিনশো কুড়ি বছর শাসন জরি রাখতে পেরেছিল।

୪.୩ ଦିଲ୍ଲି ସୁଲତାନି : ଖ୍ରିସ୍ଟୀୟ ବ୍ରୋଦଶ ଶତକେର ପ୍ରଥମ ଭାଗ

କୁତୁବୁଡ଼ିନ ଆଇବକେର (୧୨୦୬-'୧୦ ଖ୍ରି) ସମୟେ ଦିଲ୍ଲିତେ ତୁର୍କି ଶାସନ ସ୍ଵାଧୀନଭାବେ ବିକଶିତ ହତେ ଶୁରୁ କରେ । ମାମେଲୁକ (ଦାସ ବଂଶ) ସୁଲତାନରା ଛିଲେନ ଇଲବାରି ତୁର୍କି । ଇଲତୁୟମିଶେର (୧୨୧୧-'୩୬ ଖ୍ରି) ସମୟେ ଦିଲ୍ଲି ସୁଲତାନିର ସାମନେ ପ୍ରଥାନ ତିନଟି ସମସ୍ୟା ଛିଲ । ପ୍ରଥମତ, କୀଭାବେ ସାମାଜିକ ମଧ୍ୟେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଶକ୍ତିକେ ଦମନ କରା ଯାବେ ? ଦ୍ୱିତୀୟତ, କୀଭାବେ ମଧ୍ୟ ଏଶୀଆର ଦୁର୍ଧର୍ଷ ମୋଙ୍ଗଲ ଶକ୍ତିକେ ମୋକାବିଲା କରା ଯାବେ ? ଏବଂ ତୃତୀୟତ, କୀଭାବେ ସୁଲତାନିତେ ଏକଟି ରାଜବଂଶ ତୈରି କରା ଯାବେ, ଯାତେ ତାର ମୃତ୍ୟୁର ପରେ ତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଗୋଲମାଲ ଛାଡ଼ାଇ ସିଂହାସନେ ବସତେ ପାରେ ? ଇଲତୁୟମିଶ କ୍ରମାଗତ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ବିଦ୍ରୋହୀଦେର ଦମନ କରେନ । ତିନି କୌଶଳ କରେ ମୋଙ୍ଗଲଦେର ସଙ୍ଗେ ସରାସରି ଯୁଦ୍ଧ କରାର ସନ୍ତାବନା ଏଡିଯେ ଯାନ (୪.୭.୧ ଏକକ ଦେଖୋ) । ଏ ଛାଡ଼ା ତିନି ଏକଟି ରାଜବଂଶ ତୈରି କରେ ଯେତେ ପେରେଛିଲେନ । ଦିଲ୍ଲିର ଜନସାଧାରଣେର ମନେ ତିନି ବଂଶଗତ ଶାସନରେ ଏକଟି ଧାରଣା ତୈରି କରତେ ପେରେଛିଲେନ । ତାର ବଂଶେର ଶାସକରା ତାର ମୃତ୍ୟୁର ପରେଓ ତିରିଶ ବଚର ଶାସନ କରେଛିଲ ।

ଇଲତୁୟମିଶେର ସାର୍ଥକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଛିଲେନ ସୁଲତାନ ରାଜିଯା । ତାର ଶାସନକାଳ (୧୨୩୬-'୪୦ ଖ୍ରି) ଦିଲ୍ଲି ସୁଲତାନିର ଇତିହାସେ ଦୁ-ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ହେଁ ଆଛେ । ପ୍ରଥମତ, ଏହି ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷବାର ଏକଜନ ନାରୀ ଦିଲ୍ଲିର ମସନଦେ ବସେଛିଲେନ । ଦ୍ୱିତୀୟତ, ସୁଲତାନ ଓ ତୁର୍କି ଅଭିଜାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିହଲଗାନୀ-ର ସଦସ୍ୟଦେର ମଧ୍ୟେ ସମ୍ପର୍କ ଜଟିଲ ଆକାର ଧାରଣ କରେଛିଲ ।

ଇଲତୁୟମିଶେର ସନ୍ତାନଦେର ମଧ୍ୟେ ରାଜିଯା ଛିଲେନ ଯୋଗ୍ୟତମ । ଏକଜନ ନାରୀର ସିଂହାସନେ ବସା ନିଯେ ଅଭିଜାତଦେର ଏକ ଅଂଶ ଆପନ୍ତି କରେଛିଲ । ଇଲତୁୟମିଶେର ଏକ ଛେଳେ ଅଞ୍ଚ ଦିନେର ଜନ୍ୟ ଶାସକ ହଲେଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜିଯାଇ ଇଲତୁୟମିଶେର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହତେ ପେରେଛିଲେନ ।

ରାଜିଯା ସିଂହାସନେ ବସେଛିଲେନ ସେନାବାହିନୀ, ଅଭିଜାତଦେର ଏକାଂଶ ଓ ଦିଲ୍ଲିର ସାଧାରଣ ଲୋକେଦେର ସମର୍ଥନ ନିଯେ । ଉଲେମାର ଆପନ୍ତି ଥାକା ସନ୍ତ୍ରେଓ ରାଜିଯା ଅ-ମୁସଲିମଦେର ଓପର ଥେକେ ଜିଜିଯା କର ତୁଲେ ନିଯେଛିଲେନ ।

ଅନ୍ୟ ଦିକେ, ତୁର୍କି ଅଭିଜାତରା ମନେ କରେଛିଲ ଯେ ରାଜିଯା ଅ-ତୁର୍କି ଅଭିଜାତଦେର ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଚେନ । ଏର ଫଳେ ଦିଲ୍ଲିର ବାହିରେ ଯେସବ ତୁର୍କି ଅଭିଜାତରା ଛିଲ ତାରା ଗୋଡ଼ା ଥେକେଇ ରାଜିଯାର ବିରୋଧିତା କରତେ ଶୁରୁ କରେ ।



ଦେଶେର ଶାସନ ଚାଲିଯେଛେ ଏମନ ଆରୋ କଯେକଜନ ନାରୀ-ଶାସକେର ନାମ ସୁଜେ ଦେଖୋତୋ । ଦରକାରେ ବାଡ଼ିର ବଡ଼ୋଦେର ବା ଶିକ୍ଷକ/ଶିକ୍ଷିକାର ସାହାୟ ନାଓ ।

ଟୁକରୋ କଥା

ବୁଲତାନ ରାଜିଯା

ରାଜିଯା ଏକଜନ ନାରୀ ହଲେଓ ତାର ଉପାଧି ସୁଲତାନ, ସୁଲତାନ ନୟ । ଆରବ ଭାୟାଯ ସୁଲତାନା ଶବ୍ଦେର ଅର୍ଥ ହଲୋ ସୁଲତାନେର ସ୍ତ୍ରୀ । କିନ୍ତୁ, ରାଜିଯା କୋଣୋ ସୁଲତାନେର ସ୍ତ୍ରୀ ଛିଲେନ ନା । ରାଜିଯା ତାର ମୁଦ୍ରାଯ ନିଜେକେ ସୁଲତାନ ବଲେ ଦାବି କରେଛେ । ଓଠେ ସୁଗେର ଏକଜନ ଐତିହାସିକ ମିନହାଜ - ଇ ସିରାଜ ରାଜିଯାକେ ସୁଲତାନ ବଲେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରେଛେ ।

ଟୁକରୋ କଥା

ପୁରୀନ-ଇ ଚିହ୍ନଗାନି ତା ବନ୍ଦେଗାନ-ଇ ଚିହ୍ନଗାନି

ତୁର୍କାନ-ଇ ଚିହ୍ନଗାନି କଥାର
ଆକ୍ଷରିକ ମାନେ ହଲୋ ଚଲିଶ
ଜନ ତୁର୍କ ବା ଚଲିଶଟି ତୁର୍କି
ପରିବାର । ଏରା ସ୍ଥିଟୀଯ
ବ୍ରଯୋଦଶ ଶତକେ
କ୍ଷମତାଶାଲୀ ହେଁ ଉଠେଛି ।

ବନ୍ଦେଗାନ-ଇ ଚିହ୍ନଗାନି
କଥାର ମାନେ ହଲୋ ଚଲିଶ
ଜନ ବାନ୍ଦା । ବାନ୍ଦା ମାନେ
ସେବକ ବା ଅନୁଗାମୀ । ଏହି
ଦୁଟି କଥା ଦିଯେଇ
ଇଲତୁ ଷମିଶେର ଅନୁଗତ
ଯୋଦ୍ଧାଦେର ବୋକାନୋ ହତୋ ।
ନାମେ ତୁର୍କି ହଲେଓ ଏଦେର
ସବାଇ ଜାତିଗତଭାବେ ତୁର୍କି
ଛିଲ ନା । ସଂଖ୍ୟାର ଦିକ
ଥେକେଓ ତାରା ଚଲିଶ ଜନେର
ଅନେକ ବେଶି ଛିଲ । ଏରାଇ
ଛିଲ ବ୍ରଯୋଦଶ ଶତକେ
ସୁଲତାନି ଶାସନବ୍ୟବସ୍ଥାର
ପ୍ରଥାନ ଶତକ । ଏଦେର ମଧ୍ୟେ
ଥେକେଇ ଗିଯାସୁଦ୍ଦିନ
ବଲବନ ପରେ ସୁଲତାନ
ହେଁଛିଲେନ ।

ମାନଚିତ୍ର ୪.୧ :

ଦିଲ୍ଲି ସୁଲତାନି ଖ୍ରିସ୍ଟୀଯ ବ୍ରଯୋଦଶ ଶତକର ଶେଷଭାଗେ



ମାନଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନୟ ।

ଏ ଛାଡ଼ା ରାଜପୁତ ଶକ୍ତିଓ ତାର ଶାସନେର ବିରୋଧୀ ଛିଲ । ରାଜ୍ୟା କିଛୁ ବିଦ୍ରୋହ
ଦମନ କରଲେଓ ମାତ୍ର ସାଡେ ତିନ ବଚରେର ବେଶି ତାର ଶାସନ ଟେକେନି ।

୪.୮ ସୁଲତାନିର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସ୍ଥାଯିତ୍ବ ଦାନ : ଗିଯାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ

୧୨୪୦ ସ୍ଥିଟାଦେ ସୁଲତାନ ରାଜ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହୟ । ଏରପର କ୍ୟେକ ବଚର ଦିଲ୍ଲିର
ତୁର୍କି ଅଭିଭାବଦେର ସଙ୍ଗେ ସୁଲତାନ ଇଲତୁ ଷମିଶେର ବଂଶଧରଦେର କ୍ଷମତା ଦଖଲେର
ଲଡ଼ାଇ ଚଲେଛି । ଇଲତୁ ଷମିଶେର ଛେଲେ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମାହମୁଦ ଶାହେର ରାଜତ୍ଵକାଳେ
(୧୨୪୬-'୬୬ସିଂହ) ଏକଜନ ତୁର୍କି ଆମିର କ୍ଷମତାଶାଲୀ ହେଁ ଉଠେଛିଲେନ । ତାର
ନାମ ଗିଯାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ । ୧୨୬୬ ସ୍ଥିଟାଦେ ତିନି ନିଜେଇ ସୁଲତାନ ହନ ।
ଇଲତୁ ଷମିଶେର ବଂଶେର ଶାସନେର ଅବସାନ ଘଟେ । ଶୁଭୁ ହୟ ଏକ ନୃତ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ । ଏରପର
ଥେକେ ବଲବନ ଓ ତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀରା ଆରୋ ପ୍ରାୟ ସାଡେ ତିନ ଦଶକ ଶାସନ
କରେଛିଲେନ ।

বলবন এক শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ের দিল্লি সুলতানির প্রধান সমস্যা ছিল ভিতরের বিদ্রোহ। বলবন কঠোর হাতে সেগুলিকে দমন করেছিলেন। রাজতন্ত্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য তিনি দরবারে সিজদা ও পাইবস প্রথা চালু করেছিলেন। অভিজাতদের থেকে সুলতানের ক্ষমতা যে বেশি তা বোঝানোর জন্য প্রথাগুলি চালু করা হয়েছিল।

দিল্লি সুলতানিতে যখন এই সব ঘটনা ঘটছে সে সময়টা ছিল ত্রয়োদশ শতক। এই শতকে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে সুলতানি শাসনের ভিত পাকা হয়। সুলতানরা বন কেটে ফেলে, শিকারি ও পশুপালকদের তাড়িয়ে দিয়ে ঐ এলাকাতে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে মজবুত করেছিলেন। তাঁরা কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি করেন। তৈরি হয় নতুন নতুন শহর ও দুর্গ।

সুলতানি ও উত্তরাধিকার

সুলতানির প্রধান শাসক হলেন সুলতান। কিন্তু একজন সুলতান মারা গেলে তার পরে কে সিংহাসনে বসবে তা নিয়ে অনেক সময় সমস্যা দেখা দিত। ইলতুৎমিশের (মৃত্যু ১২৩৬খ্রঃ) পর থেকে আলাউদ্দিন খলজির সিংহাসনে বসার সময়ের (১২৯৬খ্রঃ) মধ্যে কেটে গিয়েছিল ঘাট বছর। এই ঘাট বছরে দশ জন সুলতান দিল্লিতে শাসন করেছিলেন। উত্তরাধিকারের কোনো সাধারণ নিয়মনীতি এই সময় ছিল না। এর ফলে ঘন ঘন শাসক বদল হয়েছে। শাসনের ভিত নড়বড়ে হয়ে থেকেছে। বর্তমান সুলতানের সন্তান বা বংশধর পরবর্তী সুলতান হবেন কি না তার কোনো ঠিক ছিল না। অভিজাতরা বিদ্রোহ করে আগের সুলতানের বংশধরকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই শাসক হয়ে বসেছে। ত্রয়োদশ শতকের দিল্লি সুলতানিতে এমন ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে।

৪.৫ দাক্ষিণাত্যে সুলতানির বিস্তার : আলাউদ্দিন খলজি

প্রথম দিকের তুর্কি সুলতানদের শাসনকালে উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় অববাহিকায় সুলতানি শাসনের ভিত পাকা হয়েছিল। এরপর সুলতানরা দাক্ষিণাত্যে ক্ষমতা বিস্তারে মন দেন। আলাউদ্দিন খলজি দিল্লির প্রথম সুলতান যিনি দক্ষিণ ভারতে সুলতানি সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান। এই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁর সেনাপতি মালিক কাফুর। (৪.২ মানচিত্র দেখো)

টুকরো কথা

সিজদা ও পাইবস

এ দুটি ছিল পারসিক প্রথা। বলবন নিজেকে পারস্যের কিংবদন্তী নায়কের বংশধর ভাবতেন। রাজদরবারে তিনি জাঁকজমক পৃষ্ঠা অনুষ্ঠান পালন করতেন। সিজদা-র অর্থ হলো সুলতানকে সাস্তাঙ্গ প্রণাম করা। আর সুলতানের পদযুগল চুম্বন করাকে বলা হতো পাইবস। এগুলো ছিল সুলতানের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক।

টুকরো কথা

খলজি বিপ্লব

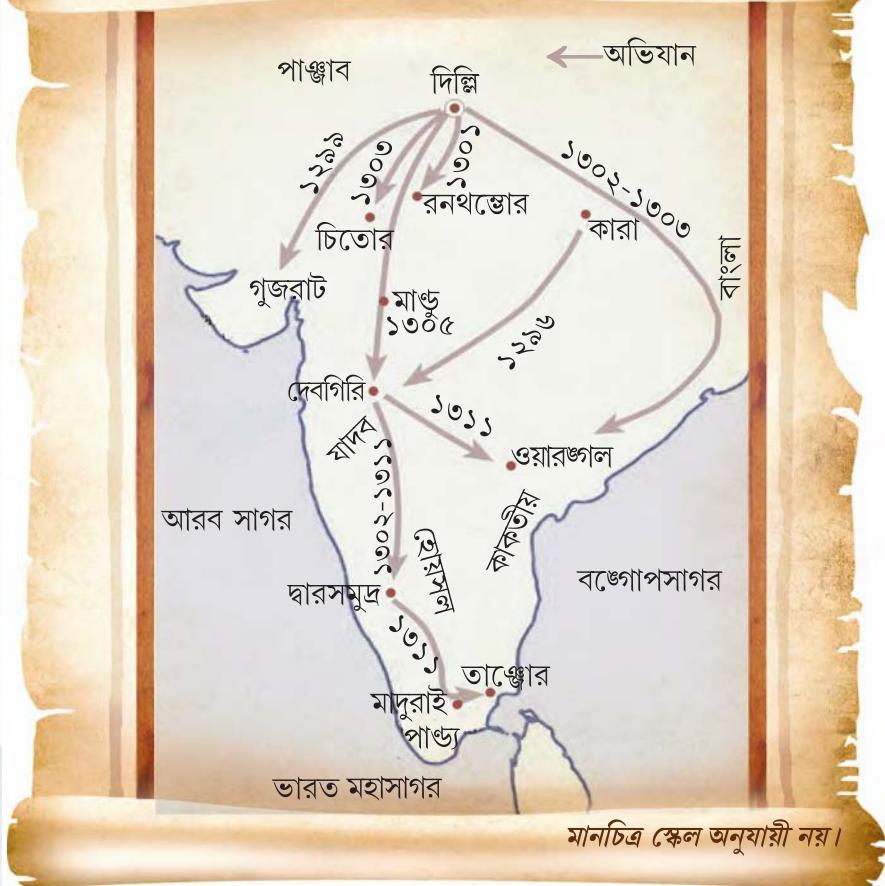
১২৯০ খ্রিস্টাব্দে জালাল-উদ্দিন ফিরোজ খলজি বলবনের বংশধরদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়ে সুলতান হন। এই ঘটনাকে ‘খলজি বিপ্লব’ বলা হয়। এর ফলে দিল্লিতে ইলবারি তুর্কি অভিজাতদের ক্ষমতা চলে যায়। তার বদলে খলজি তুর্কি ও হিন্দুস্তানিদের ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছিল।

ঠিকাণ ও প্রতিষ্ঠা

মানচিত্র ৪.২ : আলাউদ্দিন খলজির সামরিক অভিযান



এবাবে ভেবে বলোতো
উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের
বিশাল এলাকা কীভাবে
সুলতানরা শাসন করবেন?
এই বিষয়ে জানার জন্য
পড়ে দেখো ‘সুলতানদের
নিয়ন্ত্রণ’ অংশটি (৪.৭.১
থেকে ৪.৭.৩ এককগুলি
দেখো)।



উপরের মানচিত্রে কতগুলো স্থানের নাম খুঁজে পেলে? এর মধ্যে কোন কোন স্থানের নাম বর্তমানেও একই আছে তা আজকের ভারতের মানচিত্র দেখে মেলাও।
প্রয়োজনে তোমার শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্য নাও।

৪.৬ দিল্লি সুলতানি : খ্রিস্টীয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে

খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রথম কুড়ি বছর খলজি সুলতানরা দিল্লিতে
শাসন করেছিলেন। এরপর তুঘলক বংশের সুলতান গিয়াসউদ্দিন
তুঘলকের বড়ো ছেলে মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকাল (১৩২৪-
'৫১খ্রিঃ) উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে উত্তর আফ্রিকার মরক্কো দেশের তাণ্ডিয়ার
শহরের অধিবাসী ইবন বতুতা এ দেশে এসেছিলেন। তাঁর লেখা অমণ
বিবরণীর নাম অল-রিহলা। মহম্মদ বিন তুঘলকের যুগ সম্পর্কে এই প্রন্থ
একটা নির্ভরযোগ্য সূত্র।

টুকরো কথা

ইবন বতুতার পিপড়ণে ভাস্তু

ইবন বতুতার লেখা থেকে মহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিবরণ

“ভারতে ডাকে চিঠিপত্র পাঠাবার দু-রকম ব্যবস্থা আছে। ঘোড়ার ডাকের ব্যবস্থাকে ‘উলাক’ বলা হয়। এই ব্যবস্থায় প্রতি চার মাইল অন্তর ডাকের ঘোড়া রাখা হয়।
 পায়ে হাঁটা যে-ডাকের ব্যবস্থা আছে
 তাকে বলা হয় ‘দাওআ’। এই ব্যবস্থায়
 প্রত্যেক মাইলের এক-তৃতীয়াংশে
 ঘনবসতির একটি থাম থাকে।
 থামের বাইরে তিনটি তাঁবু
 থাকে। এই তাঁবুতে ডাকের
 লোকেরা কোমর বেঁধে রওনা
 হবার জন্য প্রস্তুত থাকে। এদের
 প্রত্যেকের হাতে থাকে দু-হাত লম্বা
 একটি লাঠি। প্রত্যেক লাঠির মাথায়
 কয়েকটি তামার ঘণ্টা বাঁধা থাকে। যখন
 শহর থেকে সংবাদবাহক রওনা হয় তখন
 তার এক হাতে থাকে চিঠি আর অন্য হাতে
 থাকে ঘণ্টা-বাঁধা লাঠিটি। এই চিঠি ও লাঠি
 নিয়ে সে যত দুর স্ফুর দৌড়েতে থাকে।
 দেশে নতুন লোকের আগমন-সংবাদ
 গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা চিঠি লিখে
 সুলতানকে জানিয়ে দেয়। সে-চিঠিতে
 নবাগতের নাম, তার দেহের ও পোশাকাদির
 বর্ণনা, সঙ্গীদের সংখ্যা, চাকর-বাকর, ঘোড়া
 ইত্যাদির বিবরণ থাকে। পথে চলার সময়
 অথবা বিশ্বামের সময় তাদের ব্যবহার কী
 রকম তা-ও জানানো হয় চিঠিতে।”



ଟୁକରୋ କଥା

हुघलकि काञ्चकारथाना

আজকের দিনেও কোনো ব্যক্তির খামখেয়ালি আচরণকে বলা হয় তুঘলকি কাণ্ডকারখানা। কারণ মহম্মদ বিন তুঘলককে কেউ কেউ বলেছেন ‘পাগলা রাজা’। আর তাঁর কাজকর্মকে বলা হয়েছে তুঘলকি কাণ্ড।

তুমিও কি তাই বলবে? নীচের অংশটা পড়ে নিজে ভাবো:

ମାନଚିତ୍ର 8.8 :

ভারত (আনুমানিক ১০০৫ খ্রি:)



ଜାଳ ନା କରା ଯାଇ ତାର ଜନ୍ୟ ଆଗେ ଥେକେଇ ତିନି କୋନୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେନନି । ଅନେକେ ତାମାର ମୁଦ୍ରା ଜାଳ କରେ । ବାଜାର ଥେକେ ଜାଳ ମୁଦ୍ରା ତୁଲେ ନିତେ ରାଜକୋଷ ଥେକେ ଅନେକ ସୋନା ଓ ରୂପୋର ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟାଯ କରତେ ବାଧ୍ୟ ହନ ସୁଲତାନ ।

- ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଘଲକ କରେକଜନ ଅନଭିଜାତ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ପ୍ରଶାସନେ ଉଚ୍ଚ ପଦେ ବସିଯେଛିଲେନ । ଏଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକଜନ ମଦ ତୈରି କରତେନ, ଏକଜନ ଛିଲେନ ନାପିତ, ଏକଜନ ଛିଲେନ ପାଚକ ଓ ଦୁଜନ ଛିଲେନ ମାଲି । ତୁରିକ ଅଭିଜାତଦେର କ୍ଷମତା ନିଯନ୍ତ୍ରଣେ ରାଖତେ ସୁଲତାନ ଏଭାବେ ସାଧାରଣ ହିନ୍ଦୁଷ୍ଟାନିଦେର ଓପର ନିର୍ଭରତା ଦେଖିଯେଛିଲେନ ।



- ⇒ ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଘଲକେର କାଜକର୍ମେର ମଧ୍ୟେ କୋନ କୋନ ଦିକ୍ ଠିକ୍ ଛିଲ ବଲେ ତୁମି ମନେ କରୋ ?
- ⇒ ତୁମି କି ମନେ କରୋ ଯେ ସୁଲତାନ କିଛୁ ଭୁଲ କରେଛିଲେନ ? କୀ କୀ ଭୁଲ କରେଛିଲେନ ବଲେ ତୁମି ମନେ କରୋ ?
- ⇒ ତୁମି ଯଦି ଓହି ଯୁଗେ ନତୁନ ରାଜଧାନୀ ତୈରି କରତେ ତା ହଲେ କେମନ ଅଞ୍ଚଳ ବାହତେ ଓ କୀ କୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କରତେ ?
- ⇒ ଦେଶେର ମୁଦ୍ରା ଜାଳ ହଲେ କୀ କୀ ଅସୁବିଧା ହତେ ପାରେ ବଲେ ତୁମି ମନେ କରୋ ?
- ⇒ ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଘଲକ ପ୍ରାୟ ସାତଶୋ ବଚର ଆଗେ ଶାସନ କରତେନ । ଏତବଚର ପରେଓ ତାର କାଜକର୍ମେର ଥେକେ ଆମରା କୀ ଶିଖିତେ ପାରି ?
- ⇒ ତୋମାର ଶ୍ରେଣିର ବନ୍ଧୁଦେର ମଧ୍ୟେ ଛୋଟୋ ଛୋଟୋ ଦଲ କରେ ନାଓ । ଏବାରେ ସୁଲତାନ ମହମ୍ମଦ ବିନ ତୁଘଲକେର କାଜକର୍ମେର ପକ୍ଷେ ଓ ବିପକ୍ଷେ ଯୁଦ୍ଧ ସାଜିଯେ ବନ୍ଧୁଦେର ମଧ୍ୟେ ବିତର୍କ ଜମିଯେ ତୋଳୋ ।



ঠিকাণ ও প্রতিষ্ঠা

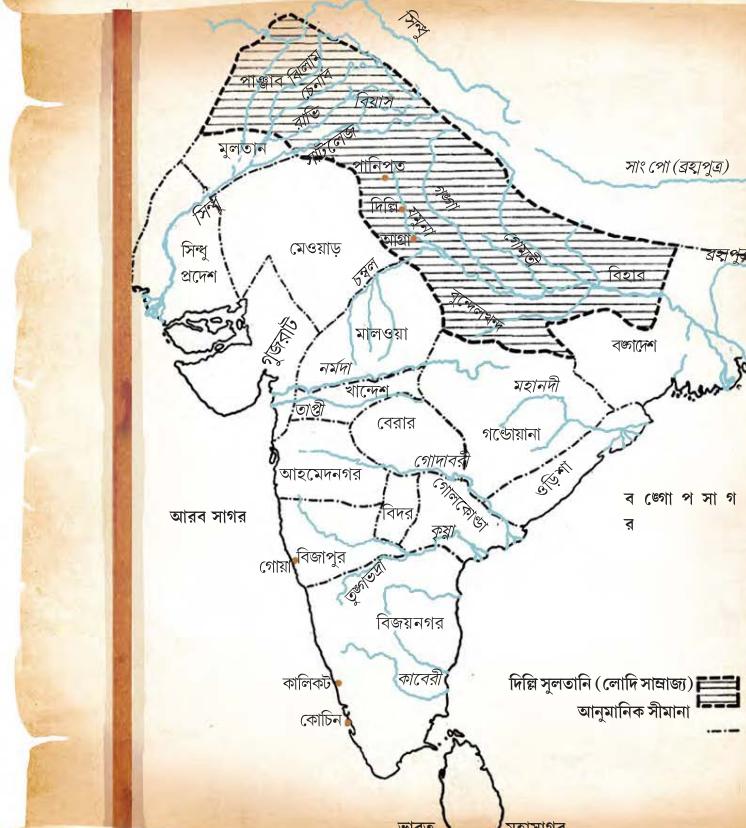
টুকরো কথা

ফিরোজ শাহের জামিদার অভিযান

ফিরোজ শাহের সামরিক অভিযানের একটা বড়ো উদ্দেশ্য ছিল দাস জোগাড় করা। ফিরোজ শাহের ১,৮০,০০০ দাস ছিল। তাদের জন্য একটা আলাদা দপ্তর খোলা হয়েছিল। রক্ষীবাহিনীতে, কারখানায়, বিভিন্ন দপ্তরে দাসরা নিযুক্ত হতো ও বেতন পেত। এভাবে সুলতান একটি অনুগত বাহিনী বানাতে চেয়েছিলেন।

মহম্মদ বিন তুঘলকের উত্তরসূরি ফিরোজ শাহ তুঘলকের (১৩৫১-'৮৮খ্রি) শাসনকালে একদিকে যেমন যুদ্ধবিগ্রহ ঘটেছে, তেমনি বেশ কিছু জনকল্যাণের সংস্কারও করা হয়েছে। ক্রমাগত যুদ্ধ করেও তিনি সুলতানি শাসনের বাইরে চলে যাওয়া এলাকাগুলোর ওপর দিল্লির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। এর থেকে মনে হয় যে তিনি সামরিক নেতা হিসাবে তত দক্ষ ছিলেন না।

মানচিত্র ৪.৫ : খ্রিস্টীয় যোড়শ সতরের গোড়ায় ভারতবর্ষ



মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়।

সৈয়দ এবং লোদি সুলতানদের শাসনকালে (১৪১৪-১৫২৬খ্রি) দিল্লি সুলতানির আকার অনেক ছোটো হয়ে এসেছিল। জৌনপুর, গুজরাট, মালওয়া ও বাংলায় স্বাধীন সুলতানি রাজ্য গড়ে উঠেছিল। রাজপুতানার মেওয়াড় ও আলওয়াড় ও দোয়াবের হিন্দু শাসকরা সুলতানি শাসনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। এছাড়া ছিল স্বাধীন রাজ্য কাশ্মীর।

তবে সুলতান বহলোল লোদির শাসনকালে (১৪৫১-১৪৯৩খঃ) জৌনপুর রাজ্য দিল্লি সুলতানির অন্তর্ভুক্ত হয়।

আফগান সুলতানদের শাসনের উল্লেখযোগ্য দিক হলো এই সময়ে রাজতন্ত্র নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছিল। সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা খিজির খান (১৪১৪-১৪২১খঃ) নিজে কখনো সুলতান উপাধি নেননি। তিনি একদিকে তুর্কো-মোঙ্গল শাসকদের প্রতি আনুগত্য জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে তিনি পূর্ববর্তী তুঘলক শাসকদের নাম খোদাই করা মুদ্রা তাঁর রাজ্যে চালু রেখেছিলেন। মধ্যযুগের ভারতে এই রকম ঘটনা আগে বা পরে কখনো ঘটেনি।

লোদি সুলতানদের শাসনকালে (১৪৫১-১৫২৬খঃ) সুলতানের ক্ষমতা খানিকটা বেড়েছিল। সুলতান বহলোল লোদি আফগানদের সাবেকি রীতি মেনে অন্যান্য আফগান সর্দারদের সঙ্গে আসন ভাগ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু লোদি আফগানদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করাও ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। পাশের জৌনপুর রাজ্য দখল করা ছিল তারই নমুনা। পরবর্তী শাসক সিকান্দর লোদি (১৪৮৯-১৫১৭খঃ) অন্যান্য আফগান সর্দারদের সঙ্গে বহলোল লোদির মতো ক্ষমতা ভাগাভাগির নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। আফগান সর্দারদের জানানো হয় যে, তারা একান্তভাবেই সুলতানের নিয়ন্ত্রণের অধীন। সুলতানের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরেই তাদের ভালো-মন্দ নির্ভর করত। এইভাবে তিনি আফগান সর্দার ও সাধারণ জনগণ উভয়ের ওপরেই নিজের সার্বভৌমিকতা প্রতিষ্ঠা করেন।

ছক ৪.১ : এক নজরে দিল্লির সুলতানি শাসন

শাসন	সময়কাল	প্রধান শাসকবৃন্দ
মামেলুক (দাস)	১২০৬-১২৯০খঃ	কুতুবউদ্দিন আইবক, ইলতুৎমিশ রাজিয়া, গিয়াসউদ্দিন বলবন
খলজি	১২৯০-১৩২০খঃ	জালালউদ্দিন খলজি আলাউদ্দিন খলজি
তুঘলক	১৩২০-১৪১২খঃ	মহম্মদ বিন তুঘলক ফিরোজ শাহ তুঘলক
সৈয়দ	১৪১৪-১৪৫১খঃ	খিজির খান
লোদি	১৪৫১-১৫২৬খঃ	বহলোল লোদি, সিকান্দর লোদি

মনে রেখো

সৈয়দ ও লোদি শাসকরা ছিলেন আফগান। এর আগের শাসকরা ছিলেন তুর্কি। তাই দিল্লির সুলতানদের শাসনকে একসঙ্গে তুর্কো-আফগান শাসন বলা হয়।



৪.৪ মানচিত্রের সঙ্গে
৪.৫ মানচিত্রের তুলনা করো। এই মানচিত্রে নতুন কোন কোন রাজ্য দেখতে পাচ্ছ তার তালিকা করো।



ଟୁକରୋ କଥା

ପାନିପତେ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ

୧୫୨୬ ଖ୍ରିସ୍ଟାବ୍ଦେ ପାନିପତେ ବାବରେର ସଜ୍ଜେ ଇରାହିମ ଲୋଦିର ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଥିଲା । ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବାବର ତୁର୍କିଦେର ଥିଲା ଶେଷା ଏକ ଧରନେର କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରେଛିଲେଣ । ଏକେ ବଲା ହୁଏ ‘ବୁମି’ କୌଶଳ । ମୁଘଲଦେର ଘୋଡ଼ସଙ୍ଗାର ତିରନ୍ଦାଜ ବାହିନୀ ଛିଲ ଖୁବ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ତାହାଡ଼ାଓ ତାଦେର ଗୋଲନ୍ଦାଜ ବାହିନୀ ଓ ଛିଲ । ବାବରେର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଲୋଦିଦେର ତୁଳନାଯା କମ ଛିଲ । କିନ୍ତୁ ବାବର ଛିଲେଣ ଯୁଦ୍ଧେ ପଟ୍ଟି । ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ ଇରାହିମ ଲୋଦିର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲି ଓ ଆଗ୍ରା ମୁଘଲଦେର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ।

ଅର୍ଥ ୪.୨ :

ପାନିପତେ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧେ
ବାବରେର ପୈନ୍ୟଦଳ
ବାବରନାମା-ର ଅର୍ଥ ।



୪.୭.୧ ମୁଲତାନଦେର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା : ସାମରିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ଭାରତେର ଉତ୍ତର-ପଞ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ଦିର୍ଘେ ବାରବାର ଅଭିଯାନକାରୀରା ଭାରତେ ଏମେହେ । ଖ୍ରିସ୍ଟୀଆ ତ୍ରୈଯାଦଶ ଶତକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ-ତୃତୀୟ ଦଶକେ (୧୨୧୮-୨୭ ଖ୍ରି:) ମୋଙ୍ଗଲ ନେତା ଚେଣ୍ଗଜ ଖାନ ମଧ୍ୟ ଓ ପଞ୍ଚିମ ଏଶ୍ୟାଯା ଝାଡ଼ର ଗତିତେ ଯେ

ଅଭିଯାନ ଚାଲାନ ତାର ସାମନେ ଓହି ଅଞ୍ଚଳେର ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଲୋ ଦୁର୍ବଲ ହୟେ ପଡ଼େଛିଲ । ଭାରତେଓ ମୋଙ୍ଗଲ ଆକ୍ରମଣେର ଆଶଙ୍କା ତୈରି ହଲୋ । ଦିଲ୍ଲିର ସୁଲତାନ ତଥନ ଇଲତୁଂମିଶ । ଏହି ଆଶଙ୍କା ପରେ ଚତୁର୍ଦଶ ଶତକେଓ ଜାରି ଛିଲ । ମୋଙ୍ଗଲ ଆକ୍ରମଣେର ସାମନେ ଦିଲ୍ଲିର ସୁଲତାନଦେର ସକଳେର ନୀତି ଏକରକମ ଛିଲ ନା । ଏବାରେ ଦେଖା ଯାକ କିଭାବେ ସୁଲତାନରା ଏହି ଶକ୍ତିର ମୋକାବିଲା କରେଛିଲେନ ।

୧୨୨୧ ଖିସ୍ଟାବ୍ଦ ଥେକେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମେ ବାରବାର ମୋଙ୍ଗଲ ଆକ୍ରମଣ ଘଟେ । ଓହି ଆକ୍ରମଣେର ସାମନେ ଶିଶ୍ଵ ନଦ ଭାରତେର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ବଲେ ଚିହ୍ନିତ ହୟ । ଇଲତୁଂମିଶ ସରାସରି ମୋଙ୍ଗଲଦେର ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧେ ଜଡ଼ିଯେ ନା ପଡ଼େ ଦିଲ୍ଲି ସୁଲତାନିକେ ବାଁଚିଯେ ଦେନ ।

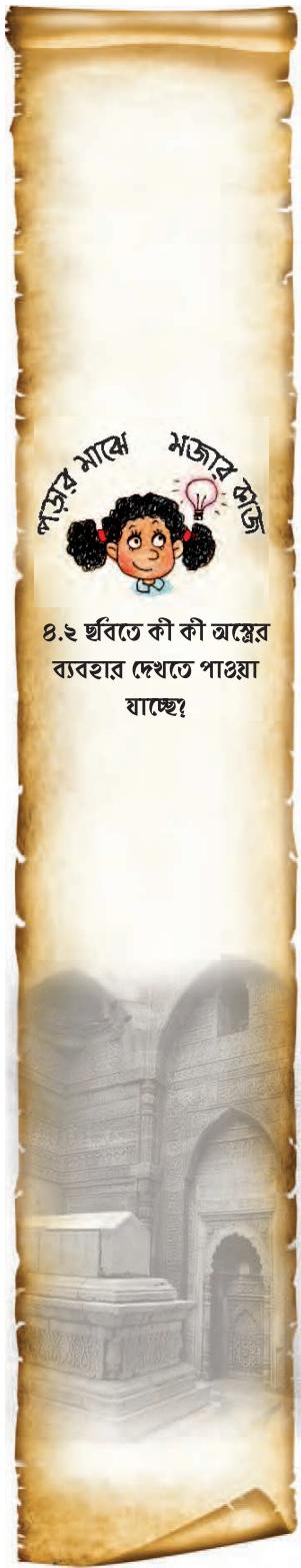
ଚେଞ୍ଜିଗଜ ମାରା ଯାଓୟାର ପର ମୋଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟ ଏକାଧିକ ଅଂଶେ ଭାଗ ହୟେ ପଡ଼େଛିଲ । ତାରା ଓହି ସମୟ ପଶ୍ଚିମ ଏଶ୍ୟା ନିଯେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୟେ ପଡ଼େ । ଏହି ସୁଯୋଗକେ କାଜେ ଲାଗିଯେ ଦିଲ୍ଲିର ସୁଲତାନରା ନିଜେଦେର ଶକ୍ତିବୃଦ୍ଧି କରେ ନିଯେଛିଲେନ । ତାରା ଏକଟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକାଠାମୋ ଓ ସ୍ଥାଯୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଗଡ଼େ ତୋଳାର ସମୟ ପୋଯେ ଯାନ । ଏର ଫଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ମୋଙ୍ଗଲ ଆକ୍ରମଣ ଠେକାତେ ତାଦେର ସୁବିଧା ହୟେଛିଲ ।

ଗିଯାସାଉଦିନ ବଲବନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାକାର ସମଯେ (୧୨୪୬-୧୬ସିଃ) ପାଞ୍ଚାବେର ଲାହୋର ଓ ମୁଲତାନ ଶହରଦୁଟୋ ପଶ୍ଚିମ ଦିକ୍ ଥେକେ ମୋଙ୍ଗଲ ଅଭିଯାନେର ସାମନେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୟେ ପଡ଼େଛିଲ । ଦିଲ୍ଲି ସୁଲତାନିର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନା ପୂର୍ବଦିକେ ଆରୋ ସରେ ଆସେ । ଝିଲାମ (ବିତନ୍ତା) ନଦୀର ବଦଳେ ଆରୋ ପୂର୍ବଦିକେ ବିପାଶା ନଦୀ ନତୁନ ସୀମାନା ହୟେଛିଲ । ବଲବନ ସୁଲତାନ ହୟେ (୧୨୬୬-୧୮୭ସିଃ) ତାବରହିନ୍ଦ (ଭାତିନ୍ଦା), ସୁନାମ ଓ ସାମାନା ଦୁର୍ଗ ସୁରକ୍ଷିତ କରେନ । ବିପାଶା ନଦୀ ବରାବର ସୈନ୍ୟ ଘାଁଟି ବସାନ । ତିନି ନିଜେ ଦିଲ୍ଲିତେ ଘାଁଟି ଗେଡେ ବସେ ଥାକେନ । ଏହି ସଙ୍ଗେ ତିନି ମୋଙ୍ଗଲଦେର କାଛେ ଦୂତ ପାଠିଯେଛିଲେନ ବୁଟନୈତିକ ଚାଲ ହିସାବେ । ୧୨୮୫ ଖିସ୍ଟାବ୍ଦେ ମୋଙ୍ଗଲଦେର ସଙ୍ଗେ ଲଡ଼ାଇୟେ ବଲବନେର ବଡ଼ୋ ଛେଲେ ଯୁଦ୍ଧରାଜ ମହମ୍ମଦ ପ୍ରାଣ ହାରାନ ।

ଆଲାଉଦିନ ଖଲାଜିର ସମଯେ (୧୨୯୬-୧୩୧୬ସିଃ) ଦିଲ୍ଲି ଦୁ-ବାର ଆକ୍ରମଣ ହୟ (୧୨୯୯/୧୩୦୦ସିଃ ଏବଂ ୧୩୦୨-୦୩ସିଃ) । ସୁଲତାନ ବିରାଟ ବାହିନୀ ଗଡ଼େ ତୋଲେନ । ସୈନିକଦେର ଥାକବାର ଜନ୍ୟ ସିରି ନାମେ ନତୁନ ଶହର ତୈରି ହୟ । ସୈନାବାହିନୀକେ ରମ୍ବଦ ଜୋଗାନୋର ଜନ୍ୟ ଦୋଯାବ ଅଞ୍ଚଳେର କୃଷକଦେର ଉପର ବୈଶି ହାରେ କର ଚାପାନୋ ହୟ । ଦୁଗନ୍ଧିର୍ମାଣ, ସୈନ୍ୟସଂପତ୍ତି ଓ ମୁଲ୍ୟନିୟମନ୍ତ୍ରଣ କରେ ସଫଳଭାବେ ମୋଙ୍ଗଲ ଆକ୍ରମଣେର ମୋକାବିଲା କରେନ ଆଲାଉଦିନ ।



ସୁଲତାନ ମାତ୍ରେ ମଜାମହିନ୍ଦୀ
ଯାହେ?



মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে ১৩২৬-২৭/১৩২৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল অভিযান হয়। সুলতান মোঙ্গলদের তাড়া করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কালানৌর ও পেশোয়ারে সীমান্তঘাঁটি মজবুত করেন। তিনি মধ্য এশিয়া অভিযানের পরিকল্পনা করেন, সেজন্য বিরাট সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। সুলতান পুরোনো দিল্লি শহরকে সেনাশিবির বানিয়ে তোলেন। শহরের অধিবাসীদের তিনি দাক্ষিণ্যাত্মে দৌলতাবাদে পাঠিয়ে দেন। সৈনিকদের বেতন দেওয়ার জন্য দোয়াব অঞ্চলে অতিরিক্ত কর চাপান। শেষ পর্যন্ত তাঁর মধ্য এশিয়া অভিযানের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। বিরাট সেনাবাহিনী ভেঙে দিতে বাধ্য হন মহম্মদ বিন তুঘলক।

টুকরো কথা

সুলতানি আদরকাহুণ্ডা

গিয়াসউদ্দিন বলবন চালিশক্রু বা বন্দেগান-ই ছিলগানির সদস্য ছিলেন। পরে নিজে যখন সুলতান হলেন, তখন যাতে কেউ তার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন করতে না পারে তার জন্য দরবারে কতগুলি নিয়ম চালু করেন তিনি। শোনা যায় বলবন খুব জমকালো পোশাক পরে দরবারে আসতেন। কোনো হাসি-তামসা বা হালকা কথা বরদাস্ত করতেন না। গভীরভাবে দরবারে শাসন কাজ চালাতেন। সুলতানকে দরবার চালাতে দেখে অতিথিদের ভয় করত। আলাউদ্দিন ও মহম্মদ বিন তুঘলক একই নীতি নেন। জাঁকজমক করে সাজানো সভার মধ্যে সবচেয়ে দামি পোশাক পরা গভীর সুলতানকে দেখে যে কেউ আলাদা করে চিনতে পারত।

৪.৭.২ সুলতানদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা : প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ

সুলতানি শাসনের প্রধান ব্যক্তি সুলতান নিজে। যুদ্ধ, আইন, বিচার, দেশ চালানোর সব ক্ষমতা সুলতানের হাতে থাকত। তবে একজন ব্যক্তি একা সব দিক সামলাতে পারেন না। তাই সুলতান মন্ত্রী ও কর্মচারীদের নিয়োগ করতেন। তবে সবাইকেই সুলতানের কাছে অনুগত থাকতে হতো। সুলতানের আদেশ ছিল শেষ কথা। এইভাবে সুলতানকে কেন্দ্র করে দিল্লিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে। একেই কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থা বলে।

কখনও কখনও কে আসলে সুলতান হওয়ার যোগ্য— তা নিয়ে গোলমাল হতো। তাই যিনি যখন সুলতান হতেন, তাঁর চেষ্টা থাকত কেউ যেন তাকে নিয়ে প্রশ্ন না করতে পারে। এর জন্য সুলতানরা নিজেদের স্বার থেকে আলাদা করে রাখতেন। আর বিচার করতেন কঠোর হাতে। গরিব বা বড়োলোক, অভিজাত বা সাধারণ মানুষ ভেদাভেদ ছিল না বিচারের সময়ে।

যে সুলতান যত ভালোভাবে সবদিক সামলাতে পারতেন, তাঁর শাসন তত বেশিদিন টিকত। তবে বলবনের সময় থেকে সুলতানের ক্ষমতা ও মর্যাদা বাড়তে থাকে। সুলতানের উপরে কেউ কথা বলতে পারত না। তার বিরোধিতা করলে শাস্তি পেতে হতো। ফলে, অভিজাতরা (আমির) আর সুলতানের ক্ষমতা ও মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন করত না। আলাউদ্দিনের সময়ে অভিজাতদের কড়া হাতে দমন করা হয়। কিন্তু, সুলতানের শাসন আলগা হয়ে পড়লেই, অভিজাতদের হাতে ক্ষমতা বেড়ে যেত।

অভিজাত ছাড়াও উলেমার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলতে হতো সুলতানকে। যেমন রাজাকে পরামর্শ দিতেন পুরোহিত, তেমনই সুলতানকে পরামর্শ দিতেন উলেমা। তবে বেশিরভাগ সময়েই উলেমার কথা শুনে চলতেন না সুলতানরা। হিন্দু-মুসলমান সব জনগণই সুলতানের প্রজা। ফলে, বাস্তবে শাসন চালাবার জন্যে যা দরকার সুলতানরা তাই করতেন। এই নিয়ে উলেমার সঙ্গে সুলতানদের গোলমালও হতো। সুলতানরা উলেমাকে শাস্তি দিতেন মাঝেমধ্যে।

তবে নিজেদের ক্ষমতা অটুট রাখতে ওমরাহ ও উলেমার সমর্থনের দরকার হতো সুলতানদের। তাই নানা উপহার ও সম্মান দিয়ে তাদের পাশে রাখতেন সুলতানরা।

সামরিক ব্যক্তিদের হাতে ভূমি রাজস্ব ও প্রশাসনিক দায়িত্ব— ইকতা ব্যবস্থা

সুলতানি শাসনব্যবস্থা প্রথম দিকে পুরোপুরি সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। পরবর্তী সুলতানরাও সামরিক শক্তিকে শাসনব্যবস্থার প্রধান স্তুতি বলে মনে করতেন। তবে তারা ধীরে ধীরে একটি সুসংহত, কেন্দ্রীয় প্রশাসন গড়ে তোলেন। নির্দিষ্ট অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীরা সুলতানের নির্দেশে রাজস্ব আদায় করার অধিকার পেতেন।

দিল্লির সুলতানরা সাম্রাজ্যের আয়তন ক্রমশ বাড়িয়ে ছিলেন। নতুন অধিকার করা অঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায় করা প্রয়োজন ছিল। সেখানে শাস্তি বজায় রাখারও দরকার ছিল। সুলতানরা যে সব রাজ্য জয় করলেন, সেই রাজ্যগুলি এক একটি প্রদেশের মতো ধরে নেওয়া হলো। এই প্রদেশ গুলিকেই বলা হতো ইকতা। ইকতার দায়িত্বে থাকতেন একজন সামরিক নেতা। তাঁকে বলা হতো ইকতাদার বা মুক্তি বা ওয়ালি। ইকতাগুলিকে ছোটো ও বড়ো এই দু-ভাগে ভাগ করা হতো। ছোটো ইকতার শাসক শুধু সামরিক দায়িত্ব পালন করতেন। আর বড়ো ইকতার শাসকদের সামরিক দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করতে হতো। সৈন্যবাহিনীর দেখাশোনা করা, বাড়তি রাজস্ব সুলতানকে দেওয়া, শাস্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ইত্যাদি দায়িত্ব বড়ো ইকতার শাসকদের নিতে হতো। ইকতাদাররা সম্পূর্ণভাবে সুলতানের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন।

টুকরো কথা

উলেমা

আরবি ভাষায় ইলম মানে হলো জ্ঞান। আলিম মানে হলো জ্ঞানী। বিশেষভাবে যারা ইসলামি শাস্ত্রে পঞ্জিত তাদের বলে আলিম। একের বেশি আলিমকে বলা হয় উলেমা। উলেমা শব্দটিই বহুবচন। তাই উলেমারা বা উলেমাদের কথাগুলো ঠিক নয়।



ଟୁକରୋ କଥା

ଇକତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଥା

ମଧ୍ୟ ଏଶ୍ୟାର ଇସଲାମୀଯ ସାମରିକ ଅଭିଜାତଦେର ଇକତା ଦେଓଯା ହତୋ । ଏହି ଇକତାଗୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମରେର ଜନ୍ୟ ଦେଓଯା ହତୋ । ଖିସ୍ତୀୟ ନବମ ଶତକେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉତ୍ସପତ୍ତି ହୁଏ । ରାଜକୋଷେ ତଥନ ସଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣେ ରାଜସ୍ବ ଜମା ପଡ଼ିଛିଲା ନା । ଏଦିକେ ଯୁଦ୍ଧ କରେଓ ତେମନ ଧନସଂପଦ ପାଓଯା ଯାଚିଲା ନା । ତାଇ ସାମରିକ ନେତାଦେର ବେତନେର ବଦଳେ ଇକତା ଦେଓଯା ହତେ ଥାକେ । ଖିସ୍ତୀୟ ଏକାଦଶ ଶତକେ ସେଲଜୁକ ତୁର୍କି ସାମରାଜ୍ୟ ଇକତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଲନ ଲକ୍ଷ କରା ଯାଏ । ଏ ସମରେ ସାମରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଅର୍ଧେକ ଅଂଶ ଇକତା ହିସାବେ ଭାଗ କରା ହୁଏ । କୋଥାଓ କୋଥାଓ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ହେବେ ଯାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ମାରା ଗେଲେ ତାର ଛେଲେ ଏକଇ ଦାଯିତ୍ୱ ପାଏ । ଅଟୋମାନ ତୁର୍କିଦେର ଆମଲେ ଇକତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକଇ ଧରନେର ଅନ୍ୟ ଏକଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଥା ଜାନା ଯାଏ । ତାକେ ବଲା ହୁଏ ତିମାର । ଆବାର ଇରାନେ ଇଲ-ଖାନଦେର ଶାସନେର ସମରେ (୧୨୫୬-୧୩୫୫ଖିଃ) ଇକତା ପ୍ରଥାର କଥା ଜାନା ଯାଏ । ମିଶରେ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ-ବ୍ରଯୋଦଶ ଶତକେ ମୁକ୍ତିଦେର କଥା ଜାନା ଯାଏ । ଦିଲ୍ଲିର ସୁଲତାନରା ସାମରାଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାର, ରାଜସ୍ବ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି-ଶୃଙ୍ଖଳା ରାଖାର ଜନ୍ୟ ଇକତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନାନା ରଦବଦଳ ଘଟିଯେଇଲେନ । ଇକତାଦାର ବା ମୁକ୍ତି ହତେ ପାରତେନ ଏକଟା ଗୋଟା ପ୍ରଦେଶେର ଶାସନକର୍ତ୍ତା । ଅଥବା, ତିନି ହତେନ ଶୁଦ୍ଧୁଇ ଏକଜନ ରାଜସ୍ବ ସଂଗ୍ରହକାରୀ, ଯିନି ନିଜେର ଭରଣପୋଷଣେର ଜନ୍ୟ ଏକଥଣ୍ଡ ଜମି ଥେକେ ରାଜସ୍ବ ଆଦାୟ କରନେନ ।

ସୁଲତାନିର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳେର ଶାସକେରା ଅନେକ ସମଯ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରାର ଚେଷ୍ଟା କରନେନ । ଜାଲାଲୁଡ଼ିନ ଖଲଜି ଅଥବା ବହଲୋଲ ଲୋଦିର ମତୋ ଅନେକେଇ ପ୍ରଥମେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାସକ ଛିଲେନ । ପରେ ତାଁରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରେ ସୁଲତାନ ହନ ।

୪.୭.୩ ସୁଲତାନଦେର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା : ଅର୍ଥନୈତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଜନକଳ୍ୟାନକର ସଂକ୍ଷାର

ରାଜକୋଷେର ଆଯ ବାଡ଼ାତେ ଆଲାଉଦିନ ଖଲଜି କତଗୁଣି ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂକ୍ଷାର କରେନ । ଆଗେର ସୁଲତାନଦେର ଦେଓଯା ଇକତା ବାଜେଯାପ୍ତ କରେନ । ଧର୍ମୀୟ କାରଣେ ଦେଓଯା ସଂପତ୍ତି ଓ ନିଷକ ଜମିଗୁଣି ଫିରିଯେ ନେନ । ସମସ୍ତ ଜମି ଜରିପ କରାନୋ ହୁଏ । ରାଜସ୍ବେ ହାରା ବାଡ଼ାନୋ ହୁଏ । ତାର ପାଶାପାଶି ସୁଲତାନ ସୁଲତାନିର ଖରଚ କମାତେଓ ଚେଷ୍ଟା କରେଇଲେନ । ଆଲାଉଦିନ ଦୋଯାବ ଅଞ୍ଚଳେର (ଗଞ୍ଜା-ସୁନ୍ଦରାଜାନାମାରି) ପାଶାପାଶି କମାତେଓ ଚେଷ୍ଟା କରେଇଲେନ ।

নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল) অধিবাসীদের কাছ থেকে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক অংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করেন। এখানে জমি উর্বর হওয়ায় চাষ হতো খুব ভালো। ভূমি রাজস্ব ছাড়াও গৃহকর, গোচারণভূমি কর, জিজিয়া কর ইত্যাদি কর রাজাদের কাছ থেকে আদায় করার নির্দেশ দেন।

টুকরো কথা

জিজিয়া ক্ষমতা ও তুরুন্ধতিদণ্ড

অ-মুসলমান প্রজাদের কাছ থেকে মুসলমান শাসকরা জিজিয়া কর আদায় করতেন। এটি ছিল একটি মাথাপিছু কর। এর বিনিময়ে অ-মুসলমানদের জীবন, ধর্ম পালনের অধিকার ও সম্পত্তির সুরক্ষা দেওয়া হতো। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে আরবের সেনাপতি মহম্মদ বিন কাশিম সিন্ধু প্রদেশে প্রথম জিজিয়া কর চালু করেছিলেন।

দিল্লি সুলতানিতে ব্রাহ্মণ, নারী, নাবালক ও দাসদের জিজিয়া দিতে হতো না। সন্ন্যাসী, অস্থি, খঙ্গ ও উন্মাদ ব্যক্তিকে যদি গরিব হতেন তবে তাদেরকেও জিজিয়া দিতে হতো না। আলাউদ্দিন খলজি খরাজের সঙ্গেই জিজিয়া নিতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রভাবশালী অ-মুসলমান ব্যক্তির আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কমানো। কারণ, সুলতান ভাবতেন তারাই সাম্রাজ্যের মধ্যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের জন্ম দিত। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (১৩২০-'২৪খ্রি) এমনভাবে জিজিয়া চাপান যাতে অ-মুসলমান প্রজারা একেবারে দরিদ্র না হয়ে পড়ে, আবার তারা মাথা ছাড়া দিয়েও উঠতেন না পারে। ফিরোজ শাহ তুঘলক খানিকটা ব্যক্তিগোষ্ঠীভাবে ব্রাহ্মণদের উপরেও জিজিয়া কর চাপিয়ে দিয়েছিলেন।

জিজিয়া করের মতো এক ধরনের কর কোনো কেনো হিন্দু রাজারাও চালু করেছিলেন। এই কর তারা চাপাতেন তাদের মুসলমান প্রজাদের উপর। ওই করকে বলা হতো তুরুন্ধতিদণ্ড (তুর্কিদের/মুসলমানদের উপর চাপানো কর)।

বাজারদর নিয়ন্ত্রণ

আলাউদ্দিন খলজির শাসন ব্যবস্থা পুরোপুরি সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। এর মধ্যে তিনি এক বিরাট সৈন্যদল গঠন করেন, এবং ঐ সৈন্যদের বেতন নির্দিষ্ট করে দেন। আলাউদ্দিন বাজারের সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম ঠিক করে দেন। আলাউদ্দিন খলজির আমলে দিল্লিতে চারাটি বড়ো বাজার ছিল। এইসব বাজারে খাদ্যদ্রব্য, ঘোড়া, কাপড়

টুকরো কথা

খরাজ, খামস,

জিজিয়া ও জাকাত

ফিরোজ তুঘলকের আমলে চার ধরনের কর আদায় করা হয়। এগুলি হলো—
খরাজ— কৃবিজমির উপর আরোপ করা কর। খামস—
যুদ্ধের সময়ে লুট করা ধন সম্পদের একটি অংশ।
জিজিয়া— অ-মুসলমানদের উপর আরোপ করা কর।
জাকাত— মুসলমানদের সম্পত্তির উপর আরোপ করা কর।

ঠিকাণ ও প্রতিষ্ঠা



ছবি ৪.৩ :
সুলতান আলাউদ্দিন খলজির
একটি সোনার মুদ্রার দৃষ্টি
পিঠ।

ইত্যাদি বিক্রিতো। বাজারদর তদারকির জন্য ‘শাহানা-ই মাস্তি’ ও ‘দেওয়ান-ই রিয়াসৎ’ নামে রাজকর্মচারী নিয়োগ করা হয়। সুলতানের ঠিক করে দেওয়া দামের থেকে বেশি দাম নিলে বা ক্রেতাকে ওজনে ঠকালে কঠোর শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আলাউদ্দিন রেশন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। প্রয়োজনের সময়ে প্রজাদের সুলতানের পক্ষ থেকে খাদ্যশস্য ও রোজের প্রয়োজনীয় জিনিস পরিমাণ মতো জোগান দেওয়া হতো।

মহম্মদ বিন তুঘলকের আর্থিক পরীক্ষার কথা তোমরা আগেই জেনেছো। তাঁর পরবর্তী সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ইসলামের রীতিনীতি এবং উল্লেমার নির্দেশে শাসন পরিচালনা করতেন। তবে বেশ কিছু জনকল্যাণকর কাজও তিনি করেছিলেন। ফিরোজ রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার করেন। ইসলামীয় রীতি অনুযায়ী যে সমস্ত কর আদায় করা যেতে পারে, শুধু সেই করগুলি নেওয়া হতো। অন্যান্য কর বাতিল করা হয়।

ফিরোজ শাহ তুঘলক একাধিক নতুন নগর, মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল এবং বাগান তৈরি করেন। দরিদ্রদের অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করেন। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি একটি দণ্ড খোলেন। সেখান থেকে চাকরি দেওয়া হতো। তিনি কৃষির উন্নতির জন্য সেচব্যবস্থার উন্নয়ন করেন। বেশ কিছু খাল খনন করা হয়। তাছাড়া যে সব জমিতে চাষ হতো না, সেই জমির সংস্কার করেন সুলতান।

৪.৮ প্রাদেশিক শাসন

মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের শেষ দিক থেকেই দিল্লির সুলতানি শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কয়েকটি আঞ্চলিক শক্তির উত্থান হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাংলায় ইলিয়াসশাহি এবং হোসেনশাহি শাসন, এবং দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর এবং বাহমনি রাজ্যের শাসন।

৪.৮.১ বাংলায় ইলিয়াসশাহি ও হোসেনশাহি শাসন

১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ লখনৌতির সিংহাসন দখল করেন। তিনি বাংলার তিনটি প্রধান রাজ্য লখনৌতি, সাতগাঁ এবং সোনারগাঁ যুক্ত করে বাংলায় স্বাধীন ইলিয়াসশাহি শাসন শুরু করলেন। ইলিয়াস শাহ পূর্ব বঙ্গ এবং কামৰূপকে তাঁর শাসনের আওতায় নিয়ে আসেন। দিল্লিতে তখন ফিরোজ শাহ তুঘলক শাসন করছেন। তিনি ইলিয়াসের রাজধানী পাঙ্গুয়া দখল করে নেন।

টুকরো কথা

দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গ

ফিরোজ শাহ তুঃস্লক যখন পাঞ্চুয়া আক্রমণ করেন, ইলিয়াস শাহ একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। এই দুগাটির কোনো চিহ্নই আজ আর নেই। দুগাটি ঘিরে ছিল গঙ্গার দুই শাখা নদী— চিরামতি এবং বালিয়া। গৌড় থেকেও এই দুগাটি খুব দূরে ছিল না। দুগাটি প্রায় দুর্ভেদ্য ছিল।

ফিরোজ শাহ সৈন্য সমেত ফিরে যাওয়ার ভান করেন। সে সময়ে ইলিয়াস শাহের সৈন্য একডালা দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে ফিরোজ শাহকে পিছন থেকে আক্রমণ করতে যায়। ফিরোজ শাহ তৈরি ছিলেন। যুদ্ধে দিল্লির সুলতান জয়ী হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিরোজ শাহ একডালা দুর্গ দখল করতে পারেননি। বাংলায় শাসক হিসেবে তাই ইলিয়াস শাহই থেকে গেলেন।



মনে রেখো

- সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-'৫৮খ্রিঃ) বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান। তিনি দিল্লির সুলতানি শাসনের আওতার বাইরে এই স্বাধীন শাসন তৈরি করেছিলেন।
- সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ ছিলেন ফারসি কাব্যের একজন সমবাদার। তাঁর আমলে বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য জোরদার হয়েছিল।
- সুলতান জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহ (যদু) (১৪১৫-'১৬, ১৪১৮-'৩৩খ্রিঃ) জন্মসূত্রে হিন্দু ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্ম থেকে তাঁর আমলে বাংলার রাজধানী মালদহের হজরত পাঞ্চুয়া থেকে গৌড়ে চলে আসে।
- অনেকে মনে করেন যে, পরবর্তী ইলিয়াসশাহি সুলতানরা ছিলেন সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহর বংশধর।
- ইলিয়াসশাহি এবং হোসেনশাহি শাসনের মাঝে বাংলায় আবিসিনীয় সুলতানরা শাসন করেছিলেন। এরা আফ্রিকার আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া থেকে এসেছিলেন। বাংলায় এদের হাবশি বলা হয়।
- আফগান নেতা শের খানের আক্রমণে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন শেষ হয়।



ছবি ৪.৪ :

শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহর
একটি মুদ্রার দৃষ্টি পিঠ।

ছক ৪.২ : এক নজরে ইলিয়াসশাহি এবং হোসেনশাহি শাসন

শাসন	সময়কাল	প্রধান শাসকবৃন্দ
ইলিয়াসশাহি	১৩৪২-১৪১৪/১৫৩৪ঃ	শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ, সিকান্দর শাহ, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ
রাজা গণেশের বংশ	আনু. ১৪১৪/১৫- ১৪৩৫খঃ	রাজা গণেশ, জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহ (যদু)
পরবর্তী ইলিয়াসশাহি	আনু. ১৪৩৫-১৪৮৬খঃ	নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ, রুক্মণউদ্দিন বরবক শাহ
হোসেনশাহি	১৪৯৩-১৫৩৮খঃ	আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, নাসিরউদ্দিন নসরৎ শাহ

টুকরো কথা

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ
ও শ্রীচৈতন্য

বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্য
ভাগবত-এ লিখেছেন যে,
সুলতান হোসেন শাহ
গৌড়ে গিয়ে শ্রীচৈতন্যের
সম্পর্কে একটি নির্দেশ দেন।
তাতে বলা হয়, চৈতন্যদেব
সবাইকে নিয়ে কীর্তন করুন
অথবা চাইলে তিনি একাকী
থাকুন। তাঁকে যদি কেউ
বিরক্ত করে, তা সে কাজি
হোক বা কোতোয়াল, তার
প্রাণদণ্ড হবে।



আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ছিলেন মধ্যযুগের বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ
শাসক। তাঁর ছাবিশ বছরের (১৪৯৩-১৫১৯খঃ) শাসনকাল বিখ্যাত তাঁর
উদারনীতির জন্য। তাঁর রাজত্বে হিন্দুদের দেওয়া হতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক
পদ। আলাউদ্দিনের উজীর, প্রধান চিকিৎসক, তাঁর প্রধান দেহরক্ষী ও
টাঁকশালের অধ্যক্ষ সবাই ছিলেন হিন্দু। সুলতান হোসেন শাহ স্বভাবে ছিলেন
তদ্দ, বিনয়ী এবং সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল। শোনা যায় যে, হোসেন
শাহ ছিলেন শ্রীচৈতন্যের ভক্ত। নাম করা দুই বৈঘ্যব ভাই রূপ ও সনাতনের
মধ্যে একজন হোসেনের দপ্তরে ব্যক্তিগত সচিব (দবির-ই খাস)
পদ পান। সাধারণ মানুষ নাকি হোসেন শাহকে কৃষ্ণের অবতার
বলে মনে করত। বাংলা ভাষা
চর্চায় ভীষণ উৎসাহী ছিলেন
হোসেন শাহ তাঁর শাসনকালে বাংলা
ভাষায় লেখালেখির চর্চা উন্নত হয়।

ইলিয়াসশাহি এবং হোসেনশাহি আমলে
বাংলার সংস্কৃতির উন্নয়ন হয়েছিল। এই সময়ে বাংলা
ভাষা ও সাহিত্য, স্থাপত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়।
এই সময়ের সুলতানরা ছিলেন অন্য ধর্মত বিষয়েও
উদার। সুলতানদের ধর্মীয় উদারতা বাংলায় সব ধর্মের
মানুষকে কাছাকাছি আসতে সাহায্য করেছিলেন।
এই সময়েই বাংলায় শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে ভক্তিবাদের
প্রচার শুরু হয়।

৪.৮.২ দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের উত্থান

গঙ্গা আছে যে সঙ্গম নামের এক ব্যক্তির ছেলেরা ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে তুঙ্গবন্দী নদীর তীরে বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের মধ্যে দুজন হলেন প্রথম হরিহর ও বুক। বিজয়নগরে ১৩৩৬ থেকে ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মোট চারটি রাজবংশ শাসন করেছিল। এই বংশগুলি হলো সঙ্গম, সালুভ, তুলুভ ও আরাবিড়ু।

প্রথম হরিহর ও বুক প্রতিষ্ঠিত সঙ্গম রাজবংশ প্রায় দেড়শো বছর টিকেছিল। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন দিতীয় দেবরায়। সঙ্গম বংশের দুর্বল শাসক বিরুপাক্ষকে সরিয়ে নরসিংহ সালুভ বিজয়নগরে সালুভ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু অযোগ্য শাসকের জন্য সালুভ রাজবংশের পতন ঘটে। সালুভ রাজবংশের সেনাপতির ছেলে বীরসিংহ সালুভ বংশের উচ্চেদ ঘটিয়ে তুলুভ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন বিজয়নগর রাজ্যের বিখ্যাত শাসক। তাঁর রাজত্বকালে বিজয়নগরের গৌরব সবচেয়ে বেড়েছিল। সে সময়ে সাম্রাজ্যের সীমা বেড়েছিল। অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল। এছাড়াও শিল্প, সাহিত্য, সংগীত এবং দর্শনশাস্ত্রের উন্নতি তাঁর সময়ে লক্ষ করা যায়। কৃষ্ণদেব রায় নিজেও একজন সাহিত্যিক ছিলেন। তেলুগু ভাষায় লেখা আমুক্তমাল্যদ প্রম্ভে তিনি রাজার কর্তব্যের কথা লিখেছেন।

মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে হাসান গঙ্গু ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন হাসান বাহমন শাহ নাম নিয়ে দাক্ষিণাত্যে বাহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি গুলবর্গায় রাজধানী স্থাপন করে তার নাম দেন আহসনাবাদ। শাসনের সুবিধার জন্য বাহমন শাহ তাঁর রাজ্যকে চারটি প্রদেশে ভাগ করেন। এই ভাগগুলি হলো গুলবর্গা, দৌলতাবাদ, বেরার এবং বিদর। প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়।

আলাউদ্দিন হাসান বাহমন শাহের মৃত্যুর (১৩৫৮খ্রিঃ) পর তাঁর ছেলে মহম্মদ শাহ গুলবর্গার শাসক হন। বাহমনি বংশের সুলতান তাজউদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৩৯৭-১৪২২ খ্রিঃ) একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন। শিল্পের প্রতিও তাঁর উৎসাহ ছিল।



ছবি ৪.৩ : গুলবর্গা দুর্গের একটি অংশ, উত্তর কর্ণাটক।

টুকরো কথা

রাজা কৃষ্ণদেব রায়

পোতুগিজ প্যার্টক পেজ রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সময়ে বিজয়নগর রাজ্য এসেছিলেন। তিনি রাজার খুব প্রশংসা করেছেন। পেজ বলেছেন—

“ রাজাদের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত এবং সর্বোত্তম একজন মহান শাসক এবং সুবিচারক, সাহসী ও সর্বগুণান্বিত”।



ঠিকাণ ও প্রতিষ্ঠা

এরপর বাহমনি রাজ্যের রাজধানী চলে আসে বিদ্র শহরে। বাহমনি রাজ্যের শাসক তৃতীয় মহম্মদের শাসনকালে (১৪৬৩-১৪৮৫) তাঁর মন্ত্রী মাহমুদ গাওয়ান বাহমনি রাজ্যের গৌরব বাড়িয়ে তুলেছিলেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা এবং পরিচালক। তাঁর নির্দেশে তৈরি বিদ্র শহরের মাদ্রাসাটি খুবই বিখ্যাত।

মাহমুদ গাওয়ানের মৃত্যুর (১৪৮১ খ্রিঃ) পর বাহমনি রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসন ভেঙে পড়ে। পাঁচটি স্বাধীন সুলতানির উন্নত হয়। সেগুলি হলো
আহমেদনগর, বিজাপুর, বেরার,
গোলকোড়া এবং বিদ্র।

৪.৬ :

মাহমুদ গাওয়ানের মাদ্রাসা,
বিদ্র (পঞ্চদশ শতক)

কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর তুলুভ
রাজত্বকালেই বিজয়নগরের সঙ্গে
বাহমনি রাজ্যের উন্নতরসূরি পাঁচটি
সুলতানির মিলিত শক্তির যুদ্ধ হয়।
১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে বানিহাটি বা
তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগর
পরাজিত হয়।



বিজয়নগর এবং বাহমনি রাজ্য দুটি প্রথম থেকেই একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটানা লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রধানত রাজনৈতিক, সামরিক, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্যই এই লড়াই হয়েছিল।

এই যুদ্ধের পরে তুলুভ শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে আরাবিভু বংশ শাসন ক্ষমতায় আসে। এই বংশের প্রথম শাসক ছিলেন তিরুমল এবং শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন দ্বিতীয় বেঙ্কট।

ভেষে বলো

বিজয়নগর এবং দক্ষিণের সুলতানিগুলির মধ্যে তিনটি অঞ্চলকে নিয়ে
সমস্যা দেখা দেয়। এই অঞ্চল গুলি হলো— তুঙ্গভদ্রা নদীর উপকূলবর্তী
অঞ্চল, কুয়া-গোদাবরী নদীর অববাহিকা অঞ্চল এবং মারাঠওয়াড়া দেশ।
এইসব জায়গার জমি উর্বর এবং বাণিজ্যের প্রভাব বেশি ছিল। মনে রেখো
এই জায়গাগুলিকে ঘিরে দ্বন্দ্ব শুধু বিজয়নগর এবং বাহমনি রাজ্যের মধ্যে
হয়নি। তার আগেও চান্দুক্য ও চোল রাজাদের মধ্যে এবং যাদব ও হোয়সল
রাজাদের মধ্যে এই অঞ্চলকে নিয়ে সংঘর্ষ হয়েছিল।

কুঁয়া নদীর উত্তর ও দক্ষিণ—দুই পারের শাসকরাই উপাধি নিতেন ‘সুলতান’। দিল্লির সুলতানদের অনেক আদবকায়দা তারা মেনে চলতেন। বিজয়নগরের শাসকরা নিজেদের বলতেন হিন্দু রাইদের (রাজা) মধ্যে সুলতান। রাজা দ্বিতীয় দেবরায় নিজের বাহিনীর জন্য তুর্কি যুদ্ধপদ্ধতি আমদানি করেন। তার আমলে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল।

তাহলে ভেবে দেখোতো, বিজয়নগর ও দক্ষিণাত্যের সুলতানি রাজ্যগুলির সংঘর্ষকে কি হিন্দু ও মুসলমান শাসকদের মধ্যে ধর্মীয় সংঘর্ষ বলা চলে?

মনে রেখো

- কুঁয়া এবং তুঙ্গভদ্রা নদীর অববাহিকা অঞ্চলকে বলা হয় রাইচুর দোয়াব।
- বাহমনি রাজ্যে দেশীয় অভিজাতদের বলা হতো দক্ষিণী। এই অঞ্চলের বাইরে থেকে যে অভিজাতরা এসে দেরবারে স্থান পেতেন তাঁদের বলা হতো পরদেশী। অর্থাৎ ‘দেশ’ বলতে মানুষ কেবল নিজের এলাকাটাই বুঝতো।

মানচিত্র ৪.৬ : বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্য



মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়।



বিদেশী পর্যটকদের বিবরণীতে বিজয়নগর



কোনো দেশ বিষয়ে
বিদেশী পর্যটকের বিবরণ
কি পুরোপুরি মেনে নেওয়া
যায়? এর পক্ষে-বিপক্ষে
তোমার কী কী ঘৃন্তি?

বিজয়নগর সাম্রাজ্যে বহু বিদেশি পর্যটক আসেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ইতালির পর্যটক নিকোলো কন্টি, পারস্যের দূত আবুর রাজাক, পোর্তুগিজ পর্যটক পেজ ও নুনিজ, দুয়ার্তে বারবেসো প্রমুখ। এঁরা সকলেই বিজয়নগরের সম্পদ দেখে বিস্মিত হন। বিজয়নগর শহরটি সাতটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। কৃষি ছিল জনসাধারণের প্রধান জীবিকা। কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচের সুবন্দোবস্ত ছিল। ভূমি রাজস্বই ছিল রাজ্যের প্রধান আয়। কৃষি ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। পোর্তুগিজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। তবে পর্যটকরা একথাও বলেছেন যে ধনী ও গরিবদের জীবনযাপনে অনেক তফাহ ছিল।

টুকরো কথা

পর্যটক পেজের পর্ণনাথ পিঙ্গলনগর

“.....নগরটি রোম শহরের মতোই বড়ো, দেখতে বড়োই সুন্দর। নগরের ও বাড়িগুলির বাগানের মধ্যে অনেক গাছের কুণ্ড আছে। স্বচ্ছ জলের অনেকগুলি খাল শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। মাঝে মাঝে আছে দীঘি, রাজপ্রাসাদের কাছেই আছে তালবন ও অন্যান্য ফলের গাছ। এই নগরের লোকসংখ্যা অসংখ্য। রাস্তায় ও অলিতে-গলিতে এত লোক ও হাতি চলাচল করে যে তার মধ্যে দিয়ে অশ্বারোহী বা পদাতিক কোনো সৈন্য যেতে পারে না।

এ শহরটির মতো এত খাওয়া- পরার
ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য কোনো শহরে
নেই। এখানে চাল, গম ও অন্যান্য
শস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।
রাস্তায় ও বাজারে ভারবাহী এত
যাঁড় চলাচল করে যে তাদের মধ্য
দিয়ে যাওয়া যায় না, হয়তো
অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে
থাকতে হয় কিংবা
অন্য রাস্তা দিয়ে
যেতে হয়।”



স্তৰ্ব ৪.৭ : বিজয়নগর সম্রাজ্যের রাজধানী হাস্পির একটি রথমান্দিরের আঁকা স্তৰ্ব।

ভেবে দেখো



ঝুঁঁজে দেখো



১। নীচের নামগুলির মধ্যে কোনটি বাকিগুলির সঙ্গে মিলছে না তার তলায় দাগ দাও :

- (ক) ইলতুৎমিশ, রাজিয়া, ইবন বতুতা, বলবন।
- (খ) তাবরহিন্দ, সুনাম, সামানা, বিলাম।
- (গ) খরাজ, খামস, জিজিয়া, আমির, জাকাত।
- (ঘ) আহমেদেনগর, বিজাপুর, গোলকোঢ়া, পাঞ্জাব, বিদর।
- (ঙ) বারবোসা, মাহমুদ গাওয়ান, পেজ, নুনিজ।

২। ‘ক’ স্তম্ভের সঙ্গে ‘খ’ স্তম্ভের সঙ্গে লেখো :

‘ক’ স্তম্ভ	‘খ’ স্তম্ভ
খলিফা	বাংলা
বলবন	দুরবাশ
খলজি বিপ্লব	বাবর
বুমি কৌশল	তুর্কিন-ই চিহলগানি
রাজা গণেশ	ইলবারি তুর্কি অভিজাতদের ক্ষমতার অবসান

৩। সংক্ষেপে (৩০-৫০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :

- (ক) দিল্লির সুলতানদের কখন খলিফাদের অনুমোদন দরকার হতো ?
- (খ) সুলতান ইলতুৎমিশের সামনে প্রথান তিনটি সমস্যা কী ছিল ?
- (গ) কারা ছিল সুলতান রাজিয়ার সমর্থক ? কারা ছিল তাঁর বিরোধী ?
- (ঘ) আলাউদ্দিন খলজি কীভাবে মোংগল আক্রমণের মোকাবিলা করেন ?
- (ঙ) ইলিয়াসশাহি এবং হোসেনশাহি আমলে বাংলার সংস্কৃতির পরিচয় দাও।

৪। বিশদে (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :

- (ক) ৪.২ মানচিত্র থেকে আলাউদ্দিন খলজির দাক্ষিণাত্য অভিযানের বিবরণ দাও।
- (খ) দিল্লির সুলতানদের সঙ্গে তাঁদের অভিজাতদের কেমন সম্বন্ধ ছিল তা লেখো।
- (গ) ইকতা কী ? কেন সুলতানরা ইকতা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন ?
- (ঘ) আলাউদ্দিন খলজির সময় দিল্লির বাজার দর নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে তোমার মতামত লেখো।
- (ঙ) বিজয়নগর ও দাক্ষিণাত্যের সুলতানি রাজ্যগুলির মধ্যে সংঘর্ষকে তুমি কী একটি ধর্মীয় লড়াই বলবে ? তোমার যুক্তি দাও।

কল্পনা করে লেখো (১০০-১৫০ টি শব্দের মধ্যে) :

- (ক) যদি তুমি সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সময়ে দিল্লির একটি বাজারে যেতে তাহলে কেমন অভিভ্রতা হতো তা লেখো।
- (খ) মনে করো তুমি আলাউদ্দিন হোসেন শাহের দরবারে একজন রাজকর্মচারী। সে যুগের ধর্মীয় অবস্থা সম্বন্ধে যদি তুমি একটি বই লিখতে তা হলে তাতে কী লিখতে ?
- (গ) মনে করো তুমি রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের আমলে পোর্তুগাল থেকে বিজয়নগর রাজ্য বেড়াতে এসেছো। এ দেশের অবস্থা দেখে তুমি নিজের দেশের এক বন্ধুকে চিঠিতে কী লিখবে ?

৫ বি. দ্র.

অধ্যায়ের ভিতরে পড়ার মাঝে মজার কাজ ও ভেবে বলো শীর্ষক এবং ভেবে দেখো খুঁজে দেখোর কল্পনা করে লেখো শীর্ষক কৃত্যালি গুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে।

